ভাঁটফুলমুখ

বর্ষ ০১ | সংখ্যা ০১ | আষাঢ় ১৪২৭ | জুন ২০২০

ই-সাময়িকী, বর্ষ ০১, সংখ্যা ০১
আষাঢ় ১৪২৭, জুন ২০২০

মূল কারিগর
আমান উল্লাহ, বদরুজ্জামান আলমগীর, হিরন্ময় চন্দ, মনিরা রহমান মিঠি, রফিক জিবরান, রুবাইয়াত রিক্তা, সাদাত সায়েম, খোন্দকার সোহেল রানা, আশিক মাহমুদ শ্যামল

bhatfulsutra@gmail.com

: ভাঁটফুলসূত্র

ভাঁটফুল
১১৯/২, উপশহর, রাজশাহী, বাংলাদেশ
ই-মেইল: bhatphul.pub@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.bhaphul.com

ভাঁটফুল - এক বুনোফুলের জাত।
ঝোপঝাড়ে, প্রায় অনাদরে নিজের ভাব রূপ রস গন্ধ নিয়ে
জনম জনম তার বাস। নির্ধারিত গন্তব্য নেই। পথের ধারে পড়ে থাকা
বুনোফুলের গন্তব্য কী! সাহিত্যদর্শন তৈরি বা মতবাদ প্রচার করার কোন
অভিপ্রায় নেই। পথিকের সঙ্গে দেখা হওয়ায়, আলাপে, মিথষ্ক্রিয়ায় যদি কোন
আভাস মেলে তবে তাকেই যেন পাথেয় করি। শরীরে বুনোগন্ধ
নিয়েই *ভাঁটফুলসূত্র* এই মহামারি, মৃত্যুতাড়িত সময়ে।
মানুষ ও প্রকৃতির মিলমিশ হোক, না জয়ে, না পরাজয়ে-
কেবল সখ্যে জীবনের জয় হোক।

সূচি

কবিতা

বদরুজ্জামান আলমগীর
- টুকরো কুড়ানো
- আলজাইমার
- রক্তকরবী
- নজরুল মুদ্রাদোষ
- বাউবাব
- কালচূর্ণ

রফিক জিবরান
- নিরুদ্দেশ বাদুড়ের জবানবন্দি
- দুইটি চড়ুই মগ্ন এক কাল্পনিক বর্তমানে
- আমার ভাগ্য ঝুলে আছে টিয়া পাখির ঠোঁটে
- পাথরের মিহিদানা
- বাস স্টপে জনৈক বেকার তরুণী

সুস্মিতা চক্রবর্তী
- আফলের গান
- থামলো পৃথিবী, পুঁজির হাট

মনিরা রহমান মিঠি
- ঝুলবারান্দা
- কেউ নেই
- চার ফোঁটা বৃষ্টি
- আমার অভয়
- স্বপ্ন বুনন

হিরন্ময় চন্দ
- এ কোন কাল

অযাচিত কালিদাস
- জীবনের ওপারে জীবন
- ভাঁটফুল

সুরভী রায়
- ছেঁড়া তারের সুর
- রোমন্থন
- রাস্তায় বেরুলে

চিত্রকর্ম

আমান উল্লাহ

হিরন্ময় চন্দ

মাইদুল রুবেল

ভাষান্তরিত কবিতা

মায়া অ্যাঞ্জেলু

ভাষান্তর: বেনজামিন রিয়াজী
- তবু জেগে উঠি
- যখন পতিত হয় বিশাল বৃক্ষেরা
- আমি জানি কেন সেই খাঁচার পাখিটি গান গায়
- আত্মশ্লাঘা
- সময় ক্ষেপণ

দারীন তাতুর

ভাষান্তর: মাজহার জীবন
- কবিতার কারাবন্দী
- চাইছো তাই ভুলে যাব

গল্প

কল্যাণী রমা
- শুভ পরিচয়

সাদাত সায়েম
- ফেরার

মাহমুদুল হক আরিফ

দুটি অণুগল্প

গ্রন্থসমালোচনা

বদরুজ্জামান আলমগীর
- পিপাসার জিনকোড: উড়ে যাবার মোরাকাবা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

হিরন্ময় চন্দ

বদরুজ্জামান আলমগীর

টুকরো কুড়ানো

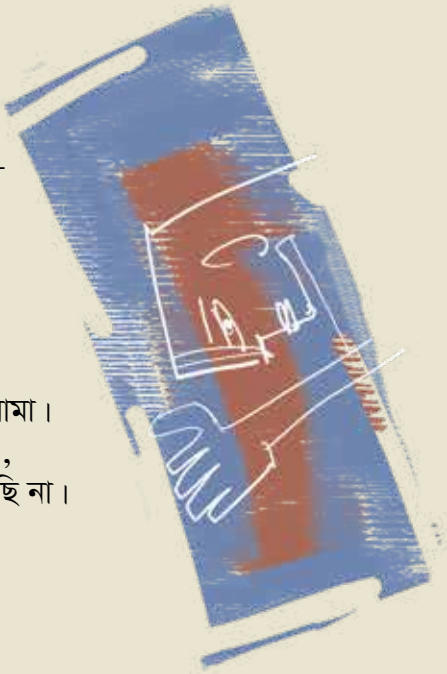

বোধ করি পরশুদিন হবে,
কী চাই- দিন তিনেক আগেও হতে পারে,
হয়তো বা কোনদিন তা'বেমালুম ভুলেই গ্যাছি-
আসবাবের দোকান থেকে
একটা চীনা আলমিরা কিনে আনি।

তারপর থেকেই আমি তা' একসাথে করছি;
এগুলোর বাক্সে খণ্ড খণ্ড ভাবে নাম্বার বা চিহ্ন
দেয়া থাকে- তারসঙ্গে আসে একটি নির্দেশনানামা।
সেভাবেই টুকরোগুলো লাগাচ্ছি তো লাগাচ্ছিই,
পুরো আলমিরা গড়ে ওঠার কোন লক্ষ্মণই দেখছি না।

হঠাৎ মনে হলো-
আচ্ছা, আমি কী জোড়া দিচ্ছি আসলে-
আলমিরার আলগা আলগা অংশ,
না-কী টুকরো টুকরো ছড়ানো ছিটানো আমার নিজেকেই এক কাঠামোয় আনতে চাইছি কেবল?

অনাদি অতীত থেকে একটা সম্পূর্ণ আমাকে গড়ে তোলার মোহে ফাটলের পর ফাটল জোড়া দিয়ে যাই
অনর্গল ভবিতব্যের দিকে।

আর ভুলে যেতে থাকি বর্ষা এসেছিল না-কী কোনদিন,
আমি কী কখনও হারিয়ে গিয়েছিলাম-
চৈত্রের নিদারুণ ঘুন্নিবাই মাঝে?

আলজাইমার

শুরুতে এরকমই হয়; ওই যে ওদিকে
মাঠের শেষ কিনারে আকাশটা মাটির দিকে
পুজার নৈবেদ্যে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে-
বাবা বুঝি দাঁড়িয়ে আছে দরজা আটকে কঠিনে কোমলে।

আমি বাবার সাথে রাগ করে দাঁড়িয়ে থাকি
সহজ নিষ্ঠাবান গানপ্রধান খোলা হাওয়ার ময়দানে।
আমার দাঁড়িয়ে থাকা দেখে প্রজাপতি এক ঘরে ফিরে আসে, মনে হয় সমুদ্র সৈকত ট্যুর করে সিন্দুকের তালা ঘেঁষে বসে।

ওখানেই প্রথম বুঝি যে সংসারে রিপ্রেজেন্টেশান বলে একটা চুক্তি আছে- মানে একজনের কাজ অন্যজনে করে দিতে পারে, রাজনৈতিক ডিসকোর্সে যার নাম ডেমোক্রেসি।

আমি প্রজাপতির কর্মকাণ্ডকে প্রতিনিধিত্ব না ভেবে
ধরে নিয়েছি প্রক্সি বলে: যার অর্থ একজনের কাজ আরেকজনে করে দেবার রীতি;

ওখান থেকেই আমি থিয়েটারে আসি। ভাল অভিনয় করতে পারি না বলে নাটকের রিহার্সালে সবসময় প্রক্সি দিয়েছি, আর শো-এর দিন সবাইকে কানপড়া দেবার জন্য বাকের পিন্টুর নির্দেশে সারারাত উইংসের আড়ালে বসে প্রম্পটিং করেছি, এই তো, এভাবেই শিখে গ্যাছি:

যে-আমি জমানার কিনারা ধরে হাঁটি, চেয়েচেয়ে তামাকের ধুঁয়া দেখি, সে-ই আমি-ই মন খারাপ হলে পানির নিচে ডুব দিয়ে ইলেকট্রিক তারের নিঃসঙ্গতা খোয়াজ খিজির হয়ে জলের নিচে লুকিয়ে রাখি।

এভাবে কাকের সঙ্গে গোলাপবালা মেয়েদের তফাৎ হয়:
কাক অতি সাবধানে লুট করে আনা সাবান
আরো সাবধানে খড়ের চালের ভিতর লুকিয়ে রাখে, আর কখনই তা খুঁজে পায় না; কিন্তু নাকফুল পরা, কী না-পরা মেয়েরা ব্লাউজের নিচে লুকিয়ে রাখা প্রেমপত্র ঠিকঠিক খুঁজে পায়।

এখনকার মেয়েরা অবশ্য প্রেমপত্রটি খুঁজে পায় না- ভাইরাল হয়ে যাবার ভয়ে তা সঙ্গেসঙ্গেই ডিলিট করে ফেলে। পরে আরো সমস্যা হয় চিহ্নিতকরণে, সব চিঠিই তো কী বোর্ডে লেখা; ফলে ওখানে আঙুলের, আঙুলের নিচে বহমান রক্তের, রক্তের

ভিতরে চলমান হৃৎস্পন্দনের, হৃৎস্পন্দনে লুকিয়ে থাকা দুরুদুরু কম্পনের, কম্পনে মিশে থাকা ভয়ের, ভয়ের জমিনে ডোরাকাটা স্মৃতির নাটাই খুলে ঘুড্ডিগুলো দিগন্তের কাছাকাছি মেলতে পারে না।

ফলে চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানে আলজাইমার বলে যে একটা অসুখ ছিল তা বিলুপ্ত হতে থাকে।

স্মৃতির নাটাই নেই বলে আর স্মৃতি হারানোর ঝুঁকিও থাকে না।

হোমোসেপিয়ানসের ইতিহাসে আকাশের ওই পাড়ে দিগন্তের কাছাকাছি রঙিন ঘুড্ডিরা বাতাসের হাতের উপর ভেসেভেসে থাকতো, তাই না?

ঠিক মনে পড়ে না!

বদরুজ্জামান আলমগীর

রক্তকরবী

যূথিকা হতে চেয়েছিল মানুষ ও বনের চিত্রাহরিণ,
মোফাক্কর প্রকল্প করেছিল- তেঁতুলগাছের ভুত হবে,
হাতে রাখতে চেয়েছিল লাল রামদার ভাষাগুণ;

ময়ূর পাখিটি বৃষ্টিতে ভিজে হতে চেয়েছিল রোদ।
রয়েল বেঙ্গল টাইগার ভেবেছিল-
আর কতো বনে বনে আনালে বিনালে ঘুরি!

এবার তাহলে বাঙলাদেশের সংবিধানের কেন্দ্রে
ছাউনি বানিয়ে থাকি, গপশপ করি,
এমনই কথা তো পণ ছিল উনিশ শো একাত্তরে;

দুনিয়া থমথম, নৈঃশব্দ্যের মৃদঙ্গে কেঁপে ওঠে
প্রচণ্ড ঝড় আসবে বলে- সব ভেঙে মায়া হবে-
কী জগৎ ওঙ্কার তুলবে তীব্র ভূমিকম্পে-

ভাবি, এই বুঝি আমাদের নন্দিনী আসে!

সড়ক ভরে যক্ষপুরীর শিশু শ্রমিকেরা
মাথা নিচু হেঁটে যায়-
হাতে পায়ে পিঠে বই, বই আর জ্ঞানের সিন্দাবাদ,
সামনে পিছনে অধ্যাপক।

ভরা শস্যের মরশুম এলো না-কী,
অন্ধ হাওয়া বাড়ি বাড়ি বিলি করে আগামী বর্ষার ঠুলি

নন্দিনী, নন্দিনী- রঞ্জনের ডাকে তুমি কেমন অবিচল-

হাতে ধরে না ঘোরাও গন্ধমের ফল!

নজরুল মুদ্রাদোষ

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরেপরেই পূর্ববাংলা জনপদের একটি আব্রু দরকার পড়ে। সেই আব্রু প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই পাওয়া যায়, এবং তা তাড়াহুড়ো করে টাটকা বাঙলাদেশের উপর চাপিয়ে দিতে তেমন দেরি হয়নি- তার নাম কাজী নজরুল ইসলাম।

মুদ্রাদোষ একটি চাপাপড়া পরিস্থিতির নাম। মনোবিজ্ঞানের অন্বেষায় দেখি- কোন মানুষের মনের মূলে থাকা একটি বাসনা উন্মিলিত হবার পথে যদি প্রাসঙ্গিক পরিবেশ পরিস্থিতির আনুকূল্য না পায় তাহলে তা আবার মনের বদ্ধ কুয়ায় জড়োসড়ো লুকিয়ে পড়ে থাকে। সেই অবদমিত আকাঙ্ক্ষাটুকুই মুদ্রাদোষের নামে বারবার জানান দেয়।

দেখবেন কখনও কখনও হয়তো দিব্যি একজন কেতাদুরস্ত লোক কারুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রায়শই- কঞ্চি, কঞ্চি বলে উঠলো। বলেই লজ্জা পায়, কুণ্ঠিত হয়ে বলে- দুঃখিত, আমি তা বলছি না- এটি আমার মুদ্রাদোষ।

অন্য আরেকজন হয়তো কথার ফাঁকেফাঁকে তার স্বাভাবিক কথার বাইরে বলে ওঠে- রে ভগান, রে ভগান! ভগবানের একটি ভাঙা রূপ।

যার মুদ্রাদোষ কঞ্চি, কঞ্চি বলার- তার মনের গহীন পানের কৌটায় হয়তো একটি আঘাতের কড়া জর্দা লেগে আছে যার সে প্রতিশোধ নিতে চায়।

অন্যদিকে যিনি কথার কিনারে কিনারে রে ভগান, রে ভগান বলছেন- তাঁর মনের খাস কামরায় একটি আতঙ্ক হয়তো দানা বেঁধে আছে- তারই ফল মনের অজান্তে রে ভগান, রে ভগান বলে ওঠা।

মানুষের যেমন মুদ্রাদোষ থাকে- একটি এন্তার জনপদেরও থাকতে পারে মুদ্রাদোষ।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে পূর্ববাঙলা জনপদের প্রাণের নিভৃতে স্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা ও সাম্যের বাসনা দানা বেঁধে ওঠে- যা চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি।

ফলে, মনের ভিতরে ডাবের নরম আকুতি বাইরের সমাজ রাষ্ট্রের শক্ত আবরণের নির্দয়তার মুখে পড়ে যে ছলকে ছলকে ওঠে তা-ই সবার মুখে নজরুল নজরুল বলার মুদ্রাদোষের ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়।

বদরুজ্জামান আলমগীর

বাউবাব

আগুন লাগে মেনিয়াপোলিস, লসএঞ্জেলেস, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়ায়- শ্বাস নিতে পারে না, জর্জ ফ্লয়েড শ্বাস নিতে পারে না। শবযাত্রীদের দমবন্ধ লাগে! পানি দাও, পানি দাও- বাউবাব কাণ্ডে জমা ছিল জল; সে-ও নাচে রাস্তায় আগুনের সুষমা- আম্মাগো পানি দাও, ফেটে গেল ছাতিমা।

হাওয়াভরা দুনিয়ায় হাওয়া নিঃশেষ- রক্তে রক্তে গড়িয়ে পড়ে হাওয়ার দানা, গ্যালাক্সির কোটি তারকা ঝরকাবিহীন চোখ- অক্সিজেনের উনতায় ছিটকে পড়া আমাজন খাণ্ডবদাহনে চক্ষুহীন হরিণ।

পকেটে পকেটে জোনাকি জ্বলে- চোখের জলে গুহাচিত্র ঘোরে- ভিসুভিয়াস, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, ডেট্রয়েট, সাইক্লোন, অগ্নিমন্থন, ঘূর্ণিবায়ে ডুবে যায় ফিলাডেলফিয়ার লিবার্টি বেল।

গর্ভে সন্তান বাবা- জানালার পাটে বসা স্মৃতিপোড়া টিয়ার গ্যাস ও নীল এসফল্ট- কালো বিদ্যুৎ আর আদিবাসী দমকা হাওয়া- ওম সর্পগন্ধা, অর্জুন, জলপাই, ওম আমলকি, আকন্দ, বাসক, ঘৃতকুমারীর পাতা। ঘুম ঘুম, বেদের পাতা নিঙরে প্লাস্টিকের ব্যাগে সাত কিলো ঘুম!

কালের দোলানো আংটা - উনিশশো চৌদ্দ, সতেরো, উনচল্লিশ, তোপখানায় বাষট্টি, উনসত্তর, উনিশশো একাত্তর, নব্বই। যতোদূরে যাই- ভালোবেসে মা তুমি আগুন দাও কাকের পাখায়- দুনিয়ার এ-মাথা ও-মাথা উড়ে উড়ে যাই পাখা ভাঙা সুরমা গাঙের চাতক।

পানি কই, পানি কই- যে ছিল আমার আবে জমজম
সে-ই যে কেমন আগুনের বোন হয়ে নাচে!

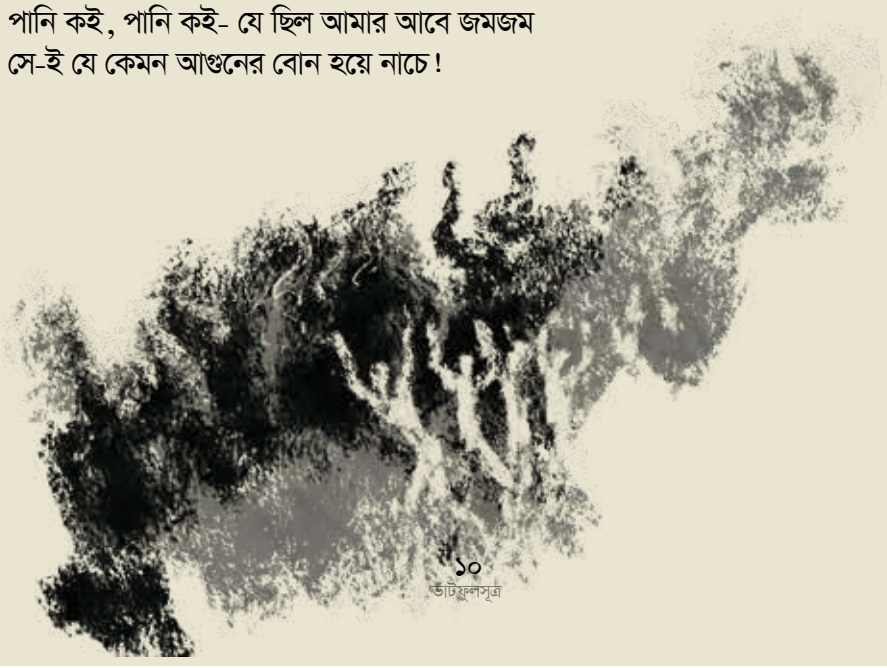

কালচূর্ণ

আমি তারা দেখি- একা দেখি না, বাবাও আমার সঙ্গে থাকে, বাবার শিথানে থাকে তার বাবা- তারও দাদা পরদাদা- এভাবে আমি ও তামাম দুনিয়া একসঙ্গে আদমসুরত আর সুরাইয়া তারা দেখি; এই যে অন্ধকারে গাছের পাতাটি নড়ে ওঠে,আর ভূত ভেবে ভয় পাই- এখানেও আমি একা নই, আমার মা-ও আমার সঙ্গে কেঁপে ওঠে, মায়ের সঙ্গে থাকে তারও মা- আরো থাকে সাতপুরুষের আগের বুড়ি দাদিমা, তারাও থাকে নিঃশ্বাসের ওঠানামায়- যাদের সাথে হয়তো আমার কোনদিন দেখাও হয়নি, প্রাণে থাকে দুনিয়ার আদি বিগ ব্যাঙ, ও আদম হাওয়া।

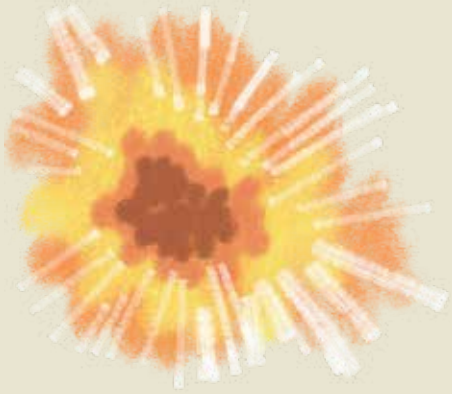

বদরুজ্জামান আলমগীর

নাট্যকার, কবি, অনুবাদক। জন্ম কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে। পড়াশোনা বাজিতপুরে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় থাকেন।

প্রকাশিত বই:

আখ্যান নাট্য: ননপুরের মেলায় একজন কমলাসুন্দরী ও একটি বাঘ আসে
আবের পাঙখা লৈয়া
প্যারাবল: হৃদপেয়ারার সুবাস

কবিতা: পিছুটানে টলটলায়মান হাওয়াগুলির ভিতর
নদীও পাশ ফেরে যদিবা হংসী বলো
দূরত্বের সুফিয়ানা

ভাষান্তরিত কবিতা: ঢেউগুলো যমজ বোন।

অবসন্ন মানুষ
মাধ্যম: কাগজে মিশ্রমাধ্যম
১০৫ সে.মি. x ৮৬ সে.মি.

আমান উল্লাহ
ছবি আঁকিয়ে। শান্ত - মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি- তে চারুকলার শিক্ষক হিসাবে কর্মরত।

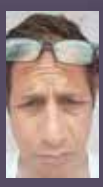

রফিক জিবরান

নিরুদ্দেশ বাদুড়ের জবানবন্দি

মানুষ শিকারী আর বাকী সব শিকার–
আকাশরেখা, হিমালয়, আল্পস
সমুদ্র বিহার; তিমি– বিজিত হৃদয়ে,
গেঁথে দেয় মুকুট যত নগ্ন অহংকার–

শিকারেরও আছে বেদনা, রক্ত–
শিরায়, ত্রস্ত হরিণের চোখে; মায়ায়
ভাসে কী মৃত্যু? –নিরুদ্দেশ
বাদুড়ের জবানবন্দি গোপনে কোথাও লেখা হয়–

রফিক জিবরান

দুইটি চড়ুই মগ্ন এক কাল্পনিক বর্তমানে

বন্দুকের আওয়াজ–
গুয়ের্নিকার পোস্টার চৌচির হয়ে ছড়িয়ে গেল
টুকরো টুকরো মগজ–
পিকাসোর চুমুর জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা
সুন্দরীদের লাল ঠোঁটে।

একটু দূরে বিয়েত্রিচ–
নরকের দরজা পেরিয়ে, দূরে– আঁকে ঢেউ
মৃত নদীর শরীরে মহাকাল গড়ে–

এই বিলুপ্ত নগরীর আত্মায় একা এ্যাডগার এ্যালান পো–
হেলেন – না এ্যানাবেল লি – কার মুখ ভাসে পাতাদের ছায়ায়!

আমি শুকি মগজের গন্ধ বসন্ত বাতাসে–
দেখি দুইটি চড়ুই মগ্ন এক কাল্পনিক বর্তমানে–

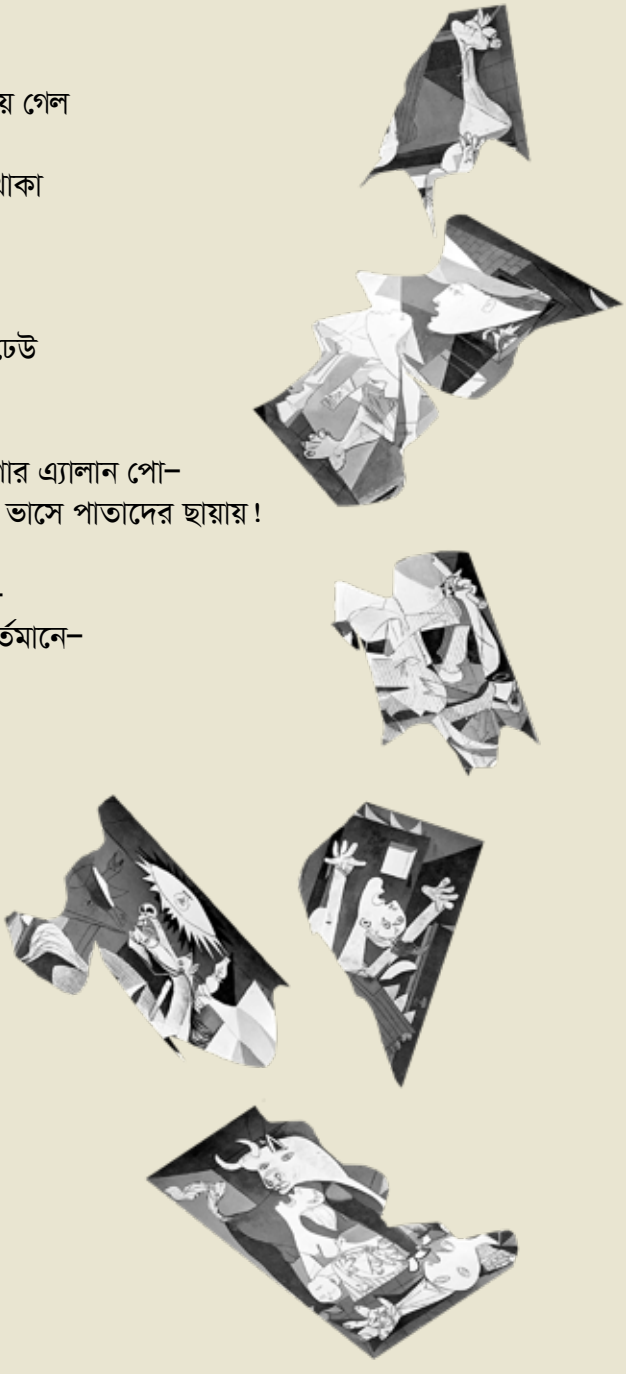

রফিক জিবরান

আমার ভাগ্য ঝুলে আছে টিয়া পাখির ঠোঁটে

আমার এখন ঘুমের ঠিক নাই, জেগে থাকার ঠিক নাই,
এই ঘুমাই তো এই জাগি, ভার্চুয়াল–
কখনো স্বপ্নে দেখি– ধ্যানমগ্ন হিরন্ময় তুলি হাতে
হেরিকেনের নরম আলো মিশে যায় ক্যানভাসে–

আমার ভাবনাগুলো পোষ না-মানা টিয়া পাখি–
মাথায় চক্কর দেয়, শব্দ করে–
আমি তাদের তাড়াই, ভয় দেখাই–
ওরা ভয় পায় না, মুখ ভেঙচায়!

গুলিস্তান চক্করে মনসুর গণকের কাছে যাই–
আমারে দেখিয়া পরম মমতায় বলেন–
টিয়া পাখি তোমারে নিয়া খেলতাছে–

আমি এখন আধাঘুম আধা জাগরণ,
আমি এখন এই রাত এই দিন,
আমি এখন এই আছি, এই নাই–

আমার ভাগ্য ঝুলে আছে টিয়া পাখির ঠোঁটে,
টিয়া পাখি আমারে নিয়া খেলতাছে–

রফিক জিবরান

পাথরের মিহিদানা

পাথরের চাঁইগুলো পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে–
পতনের প্রতিধ্বনি হাওয়ায় ভাসে।

শরীরী পাথর গড়িয়ে পড়ে আর ভাঙতে থাকে,
ভাঙতে থাকে...

অতঃপর মিহিদানা হয়ে ভেসে বেড়ায় উড়ে বেড়ায়
শব্দহীন অন্তহীন বিচ্ছেদে–

বিচ্ছেদে বিচ্ছেদে হয় দিওয়ানা পাথরের মিহিদানা।

বাস স্টপে জনৈক বেকার তরুণী

সাইনবোর্ডের লিপস্টিক সুন্দরী–
বিজ্ঞাপনে ভাসে সময়ের যৌবন
লাল-শিরিন ঠোঁট কী দারুণ, সেক্সি!

বিক্রি হয় সবই - শরীর, সোহাগ
সুখ ও অসুখ, রং ফর্সার ক্রিম
মেরিলিন মনরোর হাসি!

কী আছে আমার বিক্রি করার,
ধারালো মগজ না সেক্সি শরীর?

বাস স্টপে ভাবে জনৈক বেকার তরুণী।

রফিক জিবরান
কবি, অনুবাদক। জন্ম রাজশাহী জেলার পুঠিয়া রাজবাড়ী সংলগ্ন পুঠিয়া গ্রামে। পড়াশোনা রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে পদ্মানদীবিধৌত রাজশাহী শহরে বাস করছেন।
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ:
এগারোসিন্দুর
তিন ডানাওয়ালা পাখি (শিশু কিশোরদের জন্য)

কোভিড-১৯ এর অবয়ব
আমান উল্লাহ
মাধ্যম: কাগজে এক্রিলিক রং
৪৫ সে.মি. x ৫৪ সে.মি.

সুস্মিতা চক্রবর্তী

আফলের গান

সারারাত শোনা যায় বাতাসের ডাক
সাপের মতন তার হিঁসহিঁস বাঁক

এমন বাতাস আসে আফলের দিনে
সব কিছু গিলে খাবে এই শুধু জানে

উড়ে যায় খড়কুটা উড়ে যায় চাল
গুঁড়ি নিয়ে গাছ পড়ে পথের বেহাল

এমন মরণ আসে বাতাসের তোড়ে
মৃতদেহ স্তূপ হয় ঝড় শেষে ভোরে

পাশের দেশের শোকে ভারী হয় মন
বিষাক্ত বাতাসের এমনই কাঁদন

আমাদের নদী ভাঙা প্রতিবার আসে
জলের গভীরে মাটি ডুবে যায় ত্রাসে

সমুদ্র ফুলেফেঁপে ধেয়ে আসে তীরে
বিপদের সঙ্কেত জলের গভীরে

এবারেও ঝড়োজলে সুন্দরবন
দাঁড়ায় ঝড়ের রাতে মায়ের মতোন

ডানা মেলে আগলায় বাতাসের গতি
আগলায় আম্ফান বড় ক্ষয়ক্ষতি

২১ মে, ২০২০
[আফল একটি আঞ্চলিক শব্দ যার অর্থ প্রচণ্ড ঝড়]

থামলো পৃথিবী, পুঁজির হাট

যদিও শত্রু কালো থাবার
অদৃশ্য তবু সব থামার
থামে না মৃত্যু ক্ষুধার পেট
মানুষ ত্রস্ত এ কোন দেশ

দেখো কী শক্তি অনুজীবের
থামলো পৃথিবী পুঁজির হাট
মৃত্যুভয়ের এ মহামারী
উদোম রাষ্ট্র ঠাটেরবাট

রাস্তা বন্ধ গতির শেষ
ছোঁয়াচে শত্রু আপনজন
ঘরেতে বন্দী লাশের দ্বেষ
পৃথক বিম্বে এ কোন্ মন

বাইরে জান্‌লা নিমের গাছ
বাতাসে বইছে ফুলের ঘ্রাণ
পাখির কুঞ্জে ফেরার টান
শান্ত সন্ধ্যা কী আনচান

এবার বাঁচলে ভাবো মানুষ
নতুন ভাবনা বাঁচার পাঠ
লাভের মুদ্রা লোভের হার
সামনে সূর্য জৈব মাঠ

রাজশাহী: ১০ এপ্রিল, ২০২০

* কবিতার নিমগাছটি আমার জানালার পাশে! ইদানিং তাতে ছোট ছোট ফুল এসেছে! বাতাসে তার গন্ধও আসে।

সুস্মিতা চক্রবর্তী
কবি, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

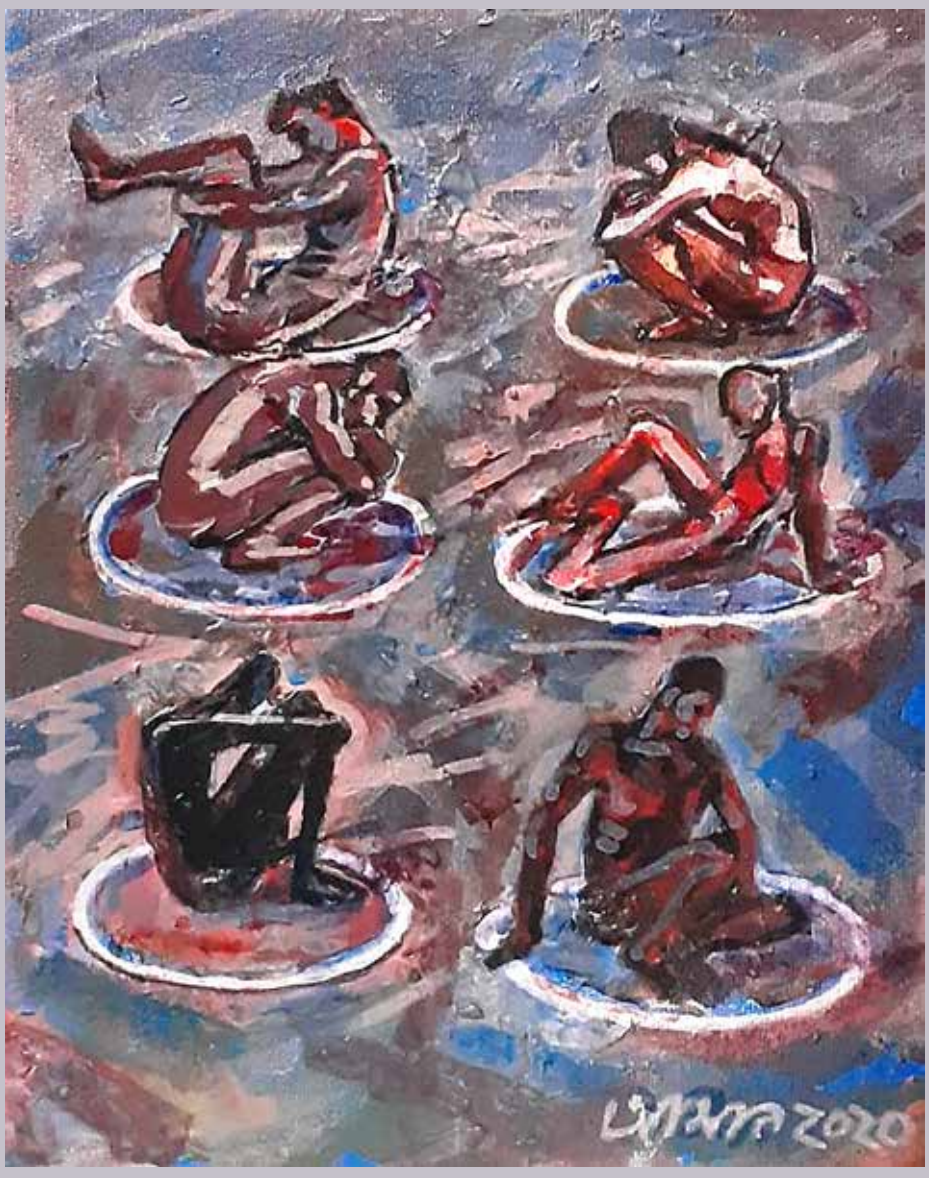

সামাজিক দূরত্ব-১
আমান উল্লাহ
কাগজে এক্রিলিক রং
সাইজ: ৮ x ১০ ইঞ্চি

মনিরা রহমান মিঠি

কেউ নেই

পথের মত দূরে ছিলো যে জলাধার
সেইখানে হেঁটে যেতে যেতে
পার হয়েছি অনেক
শিমুল পলাশ বন
মেখেছি বাতাসে উড়ে আসা পুষ্পরেণু
বিন্দু বিন্দু শিশির জলে
ভিজিয়েছি ঠোঁট
চোখের কোল ঘেঁষে
অপার্থিব মায়া কাজল
আর কানের মানচিত্রে
কুহক ভরে উঠতেই
সামনে জমাটি বিষন্ন কুয়াশা
ঢেকে ফেলে চরাচর
ওপাশে কেউ নেই.....

মনিরা রহমান মিঠি

ঝুলবারান্দা

বাড়ির অন্দরে ঠাসাঠাসি ভীড় আসবাবের
পুরাতনে নতুনে মাখামাখি
অজস্র দরকারী অদরকারী
হাড়ি পাতিলের ঠোকাঠুকি
কাপড় জামার ভেতর
বেড়ে ওঠে ফাঙ্গাস
ঘুলঘুলিতে টিকটিকির সংসার
ক্রমেই বড় হয়
রান্নাঘরে আরশোলার,
নতুন টিভির পাশে পুরাতন খানি
রঙ হারিয়ে ক্রমশ ফ্যাকাসে,
ড্রয়ারে ড্রয়ারে জমে ওঠে
রাজ্যের আবর্জনা
কোনোটাবা খোলাই হয়না
মাসের পর মাস।

এইসব জীবনের টুকিটাকি
ঝুঁকে পড়ে আলনায় জমে ওঠা
কাপড়ের মত...
ঢেকে ফেলে অস্তিত্বের সার

তখন ঘরের সাথে
একটি ঝুলবারন্দা চাই
একটু নিঃশ্বাস নেবার...

মনিরা রহমান মিঠি

চার ফোঁটা বৃষ্টি

শেষ বিকেলের চারফোঁটা বৃষ্টিতে
উঠে আসে সোঁদা মাটির ঘ্রাণ
ঘিরে ফেলে সন্ধ্যায় ফুটে ওঠা
সব ফুলের সৌরভ
ঘিরে ফেলে রোজকার
গৃহস্থালির নানা গন্ধ
আর মিশে যায়
শরীরের নোনা শোণিতে
ফুসফুসের খাঁজে খাঁজে
মগজের কোষে কোষে
শুধু দূরে এক মিথ পাখি
তৃষ্ণা না মেটায়
ডেকে চলে অবিরাম
ফটিক জল! ফটিক জল!

আমার অভয়

সবাই বলছে চারিদিকে মহামারি
চারিদিকে আণুবীক্ষণিক সন্ত্রাস
ওঁৎ পেতে আছে ঠিক
আমার বাড়ির দরজায়
ফুটপাতে রাস্তায় বাজারে
এমনকি সুগন্ধি বাতাসেও
ভেসে আসতে পারে নিমেষে
পরমাণু বোমার মত
আমার শ্বাসনালী, আমার ফুসফুস
মূহুর্তেই চলে যাবে তার দখলে
লাল রক্ত বরফ বরফ নীল
প্রতিটি নিঃশ্বাসে ছড়িয়ে যাবে
আয়ুক্ষয়ের বিষ
পায়ের শর্ষে ছুড়ে ফেলে
ঘরের চৌহদ্দিতে
কুসুম কুসুম ঘুমে
কাটাই প্রহর
যোজন যোজন পেছনে ফেলে
একলা আমার অভয় হয়ে
তুমি থাকো পাশটি ঘেঁষে।

স্বপ্ন বুনন

মাঝপথে ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন
ফের দেখবো ব্লুলে
বালিশ উল্টে দেওয়া
চোখের তারা অন্ধকারের ঘোরে
ডুবে যায় আবার
কালো জলে ডিঙা বেয়ে
যখন কেবল রঙের বুনন
হলো শুরু
অর্ফিয়ুসের মত ভুল হলো পুনর্বার
ঘুরে দেখেছিলো পাতালপুরের
দুস্তর পারাবারে আছে কি তার প্রেম!
তোমায় অনুভবে চোখ মেলতেই
প্রায় জুড়ে যাওয়া স্বপ্ন
হলো নিমেষে উধাও....

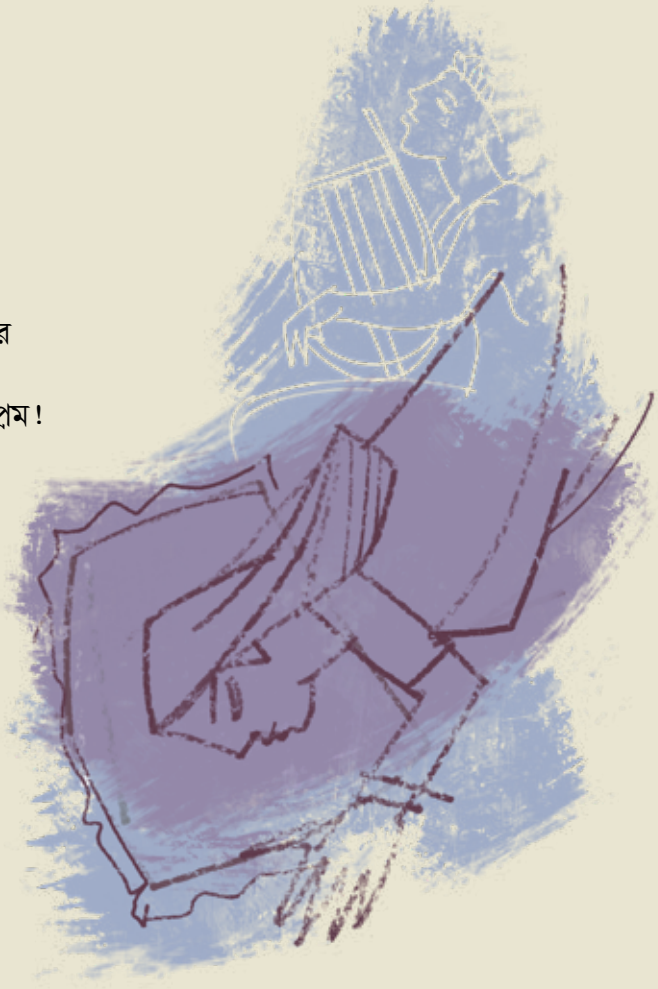

মনিরা রহমান মিঠি
জন্ম কুষ্টিয়া। শৈশব, বেড়ে ওঠা, পড়াশোনা, বর্তমান– সবকিছুই রাজশাহীতে। স্কুল জীবনেই আবৃত্তির সাথে পথ চলার শুরু। কবিতা পাঠেরও শুরু। এখন অবধি কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক। সহসভাপতি রাজশাহী আবৃত্তি পরিষদ।

স্থবিরতা
হিরন্ময় চন্দ
মাধ্যম: ক্যানভাসে এক্রিলিক রং
সাইজ: ১৪ইঞ্চি x ২৪ইঞ্চি

হিরন্ময় চন্দ

এ কোন কাল

শুরু হয়ে গেছে জোর তাড়া
ঘুরে যাও, ঘুরে যাও...
অফিস নেই, স্কুল নেই, টাউন সার্ভিস নেই।
ঘরে যাও, ঘুরে যাও।

এ ঘর কতটুকু ঘর
তার সীমা কখনও ভাবেনি কেউ
এ ঘর কেমন ঘর, বাসর ঘর, একান্তে নীরব থাকা শৌচাগার নাকি,
নাকি একদম শেষ নিদ্রার কবর।

কত ব্যস্ততা আমাদের! কখনও তা অজুহাত বা সত্যতা।
না কোন অজুহাত আর চলছেনা।
দেয়ালের ঘড়িগুলো স্থির নাকি নষ্ট হয়ে আছে, না কি ব্যাটারি নেই ?
কেউ দেখছেনা তাকিয়ে-
সকালের সূর্য উঠেছে না কি, কখন সন্ধ্যা হলো,
এতোবড়ো রাত্রিটা বা কাটবেই কীভাবে
বিছানায় শুধু এপাশ আর ওপাশ।

কখনওবা বাজার করেছি অনেক বিশাল ফর্দের
এটা ওটা শুধু খরচ আর খরচ, তার হিসাব হয়তোবা কখনো
শেষবোধি - ইকুয়েলটুতে পৌঁছায়।
কিন্তু জীবন খরচের সীমানাতো মিলছেনা আজ অবধি।
যোগ শুধু খরচের অংকে-

একবার বিক্রমপুরে পদ্মার ভাঙ্গন দেখতে গিয়েছিলাম।
চোখের সামনে বিলীন হলো জনবসতি, স্কুল, ব্যস্ত বাজার,
মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন হলো বিশাল ঢেউয়ের তোড়ে।
সেই ভিটার মানুষ কখনও কী ভেবেছে,
আবার দীর্ঘ সময় পর এসে খুঁজবে তার ভিটার চিহ্ন।

আমরা কি আবার এসে দাঁড়াবো আমাদের অস্তিত্বে,
বুক উঁচিয়ে বলবো এই সভ্যতা আমার গর্বের, আমার অহংকার?

হিরন্ময় চন্দ
ছবি আঁকিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ থেকে অংকন ও চিত্রায়ণ বিভাগে এম. এফ. এ করেছেন। এস, এম, সুলতান ফাইন আর্ট কলেজ, যশোর এর শিক্ষক। যশোর থেকে শুরু 'বাংলা বর্ষবরণ শোভাযাত্রার' অন্যতম উদ্যোক্তা ।

অযাচিত কালিদাস

জীবনের ওপারে জীবন

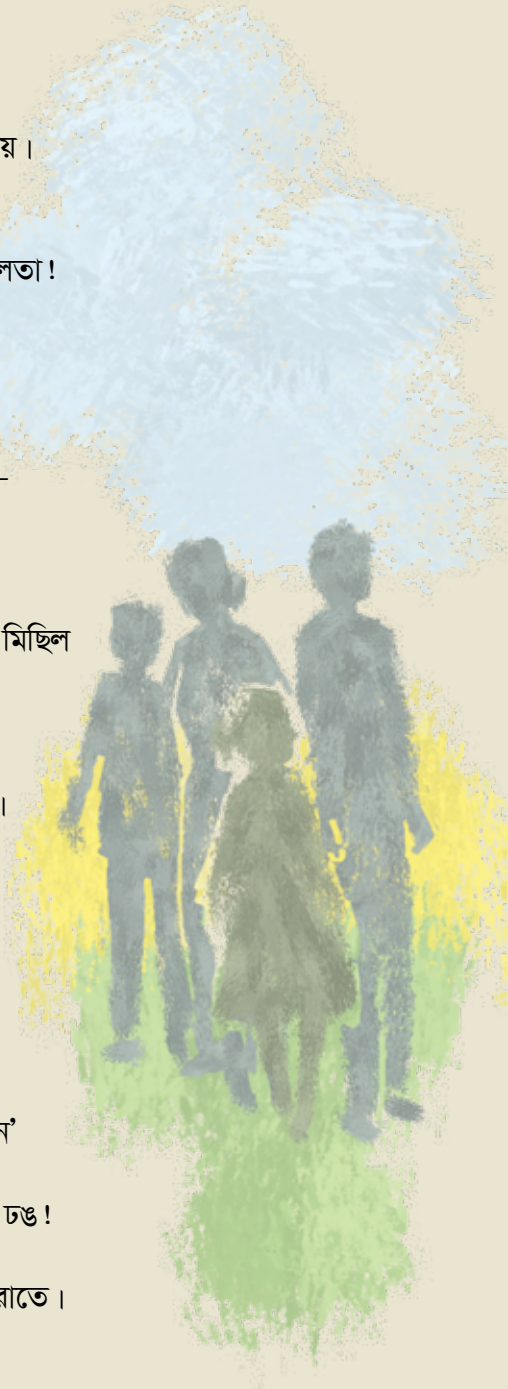

যদি এই মৃত্যু মিছিল থেকে বেঁচে যাও
দেখো ঘরবন্দী 'জীবনের ওপারে জীবন', বিরাট বিস্ময়।
আকাশের সামিয়ানা অদ্ভুত উজ্জ্বল
ফিরে পাবে বাতাস, তার আদিম ফল্গুধারা
খুন হওয়া এ শহরে, আবার নতুন করে জন্মেছে স্বর্ণলতা!
কৃষ্ণচূড়ায় মাখা রক্তিম পথ, মনে হবে -
ভেসে যাওয়া ভালোবাসা মৃত স্রোতস্বিনী।

রূদ্ধশ্বাসে তুমি বের হইয়ো, শান্ত থেকো,
মুখ তুলে আকাশের ধাবমান মেঘ সাথে হেঁটে হেঁটে -
বুক ভরে নিশ্বাসে ভালোবাসা মেখো। আর-
ধীর পায়ে গিয়ে বসো নিঃসঙ্গ বেদীটায়;
যার পাশে বয়ে চলে মৃত স্রোতস্বিনী।
শোকাহত নাগরিক ফ্রেমে, তখনো রইবে কিছু মৌন মিছিল
আর গুঞ্জনে ভেসে যাবে, হৃদয় আহুতি গত শত।

আমায় পড়বে মনে অকারণ - অহেতুক জানি
চশমার ফাঁক গলে কুয়াশা নামবে যদি, সামলে নিও।
হৃদয়ের পাড় ভাঙা পদ্ম পুকুর পাশে শুয়ে রব।
যদি কভু ভুলে গিয়ে অঞ্জলি দিতে চায় মন
হঠাৎ পড়বে মনে থেমে থাকা মেঘের পিওন!
ক্ষণকাল আশ্লেষে ঘটাবে বিস্ময়
তারপর সুস্থির, আবেশের ছোঁয়া মাখা প্রাণ।

যদি এই মৃত্যু মিছিল থেকে বেঁচে যাও
প্রিয়, তব নতুন লহরে বেঁধো 'জীবনের ওপারে জীবন'
সঞ্চিত অভিজ্ঞান, সাথে রেখো হিসেবের ছকে।
যেমন সাজবে মহী রূপে-রসে, ফিরে পাওয়া যৌবনা ঢঙ!
দিতে পারিনাই যেই স্বাদ, কিংবা তোমার আহ্লাদ
সবটুকু হোক আস্বাদ, - নব সাজে প্রতি ক্ষণ, প্রতি রাতে।
... দূর হতে চেয়ে রব, তৃপ্তিতে চোখ বোজা রেখে।

ভাঁটফুল

মনে হয় আর কভু দেখিবার পাবো নাকো, পাল তোলা নাও
কোন সুরে গেয়ে গেয়ে মৃদু লয়ে ভেসে যায়, ছলাৎ ছলাৎ করা বাও।
ঘাসের বিছানে বসে আর কভু হবে কি গোপনে শোনা, চাঁদ
আর নদীদের কথা; কি আবেশে কথামালা ধীর বয়ে যায়।
আমি শুধু পাড়ে বসে দেখিবার চাই ঐ, লহমায় জ্বলে ওঠা -
আঁধারের চোখে সেই, স্বর্গীয় হাসির ঝিলিক।
হয়তো আর দেখিব না ভাঁটফুল তারা হয়ে জ্বলে;
কাশফুল ঝাঁক বেধে মিছিলে মুখর নদী চরে।
যাক..., তবু বেঁচে থাক, আমাদের সেইসব কথামালা সুর,
মরে যাক, এই মনে কদাচিৎ উঁকিঝুঁকি মারে যে অসুর!

নিভে যাওয়া আলোকেরে কে বা মনে রাখে? ... অথবা সেই -
প্রদীপেরে কভু, সলতের নেই যার আবশেষ? সময়ের পাড় -
বেয়ে ওপারে হারিয়ে গেলে,
খোঁজ নিতে কে বা দেয় উঁকি?
তবুও আজন্ম সাধ, ভানুমতী সুখে থাক...; অযাচিত মুছে
যাক প্রেমে।
চাঁদ ডুবে গেলে পরে, আকশে হেলান দেয়া ভাঁটফুলে
কুয়াশারা ঝরে।
তবুও উর্বিরূহ মরে গিয়ে কখনোবা, উপল বনের মাঝে বাঁচে।

আক্ষেপ বাজে এই বুকে, হয়তো সে রাত আসিবে না
যে রাতের আগল ভেঙে, ...আলোক ঝর্ণাতলে
শুচিতার স্নানকালে, একাকার দু'জনাতে মিশে! তোমার
কোলের পরে মাথা রেখে, কী এক মায়ার টানে, গন্ধে বিবশ;
কভু কি দেখিব আর, চাঁদ ধোয়া রাত্রির রূপ, ঐ হাস্নাহেনার ছায়ে বসে!
কবে আর বাজিবে সেই রাগ? চাঁদ ডুবে গেলে পরে যেই ক্ষণে
পৃথিবীর জেগে ওঠে ভাব! সেইক্ষণে আমি-তুমি একসাথে - বসিব কাঁঠালচাঁপা তলে,
আমাদের পানে চেয়ে হু-হুম সম্ভাষণে
ডাক দেবে রাতজাগা পাখি! ...যেন, আমি সুখ - তুমি
সারি; আরো শত ইতিহাস বাকী!

কভু কী আসিবে সেই দিন? - সহস্র অলীক যত সাধ অপূরণ,
এই বাসে..., গ্রাসাচ্ছাদন আশে..., পায়নি যে মুক্তির আস্বাদ?
আশা তবুও থাক বেঁচে, এই মনে সযতনে, আবদ্ধ গৃহবাস শেষে

হয়তো আসিবে সেই ক্ষণ। যদি তব বেঁচে থাকি, নিশ্চয়ই যেন আমি
হিজলের ভিড়ে মিশে, আলোকলতার পাশে হাঁটি
বুনো ফুল বিছাবে গন্ধ সেই পথে, ভাঁটফুল তারা হয়ে জ্বলে। হয়তোবা পথ শেষে,

মিলিবে অমরাবতী; নাহয় -
আঁধার পারে, হয়ে রব আসীমের সাথী।

তবু যদি ঠাঁই নাহি মেলে, অসীম যদিবা বলে -
"এখনো অনেকখানি বাকী, ফিরে এসো প্রেম মেলে যদি"! ...
কুমারী নদীর বাঁকে, যেইখানে সুর তুলে ঢেউ নিরবধি;
সেইখানে হবে আশ্রয়। জেগে রব আজন্ম ভাঁটফুল হয়ে, জানি -
কোনো একদিন ঠিকই ক্ষণিকের আহ্লাদে, ঠাঁই হবে তোমার খোঁপায়।
আর সেদিন মুক্তি হবে, তোমার স্পর্শ নিয়ে, আসীমে মিলিব নিশ্চয়।
উদাত্ত ভাঁটফুল তবু রবে পৃথিবীর পরে, বুকের গহীনে শুধু
রক্তাভ দাগ নিয়ে, অযাচিত সেইসব ফিরে ফিরে ভাঁটফুলে বাঁচে।

অযাচিত কালিদাস
খোন্দকার সোহেল রানা– অযাচিত কালিদাস নামে লেখেন। ছাত্রজীবনে থিয়েটারই ছিল ধ্যান, জ্ঞান। উন্নয়নকর্মী হিসেবে কাজ করছেন এক যুগের অধিক।

বিবসনা-১
কাগজে এক্রিলিক রং
সাইজ: ১৮ সে.মি. x ১২ সে.মি.

মাইদুল রুবেল
ছবি আঁকিয়ে। শান্ত - মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি- তে চারুকলার শিক্ষক হিসাবে কর্মরত।

সুরভী রায়

ছেঁড়া তারের সুর

শেষমেশ,
বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাহাড় দেখতে গিয়েছিলাম শিবব্রত। তোমার ঘরকুনো প্রেম
আমায় বাঁধতে পারেনি!

দু'চাখের জমে থাকা বাষ্প হওয়া জলদের
রেখে এসেছি মেঘে ছাওয়া পাহাড়ে!

কখনো পাহাড়ে গেলে দেখবে,
ওখানে বৃষ্টির বেগ কত উদ্দাম ও স্বাধীন!
ওরা কারো অযথা অপেক্ষায় থাকে না।

আমি শুধু চাই,
একদিন পাহাড়ের গা বেয়ে তুমিও ওঠো।
এমন গূঢ় উপলব্ধি তোমারও হোক,
ঘটমান বর্তমানে ভরা এ জীবনে,
প্রেম বাঁধতে পারে না
কিংবা ভাঙতে পারে না, বাস্তবতায় ভরা
নারী-পুরুষের সাংসারিক মন ও মগজ!
অবাধ্য পাহাড় হয়ে সময় বেড়ে চলে, খুব বড় হয়।
পাথরের বুক ক্ষয়ে ক্ষয়ে যে পথ গড়ে ওঠে
সেসব পথ পাহাড়ের কোল আগলে রাখে যত্নে!

শিবব্রত,
মানুষ যে কিসে বাঁধা পড়ে সেটা বলা মুশকিল!
পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যে মেঘেদের বসতি,
তাতে প্রেম কতখানি আছে কে জানে!
মেঘ জানে বৃষ্টি ঝরিয়ে নয়,
অমন পাহাড়ের বুক জুড়ে
পাথরের খাঁজে খাঁজে ফুল ফুটিয়ে
তবেই বাঁধতে হয় সুর!
শোন, এবার মন দিয়ে ভায়োলিন শিখে নাও।
তোমার জানলার রৌদ্দুরে
সুরেলা সকাল আসুক প্রতিদিন,
নিজের মতো আমিও পাহাড়ে পাড়ি জমাই!

সুরভী রায়

রোমন্থন

দ্বিতীয় চুমুক দেবার আগে ভেবেছিলাম,
সমুদ্র সমুদ্র একটা বাতাস খেলে গেলে
মন্দ হতো না!
আকাশটাকে উষা রাঙাবার আগেই
যদি ঢেলে দেওয়া যেত উত্তাপ মাখা স্কারলেট... দিনটা অন্যরকম একটা ভাব নিয়ে শুরু হতো!
যে সব বুদবুদ দলবেঁধে যুক্ত হয়ে
সাঁতরে বেড়াচ্ছিল,
ওদের পরিভ্রমণ বারবার ফিরিয়ে নিচ্ছিলো
বৃষ্টি ভেজা জল জমা দিনে,
কাগজে বানানো নৌকোর গলুইয়ে!
অথচ, প্রথম চুমুকের আগেই যেসব ঘূর্ণন ঘটে গ্যাছে.....
সেখানে ভেঙেছে পিপীলিকাদের অভিপ্রায়! গ্যাসস্টোভের
হলুদাভ-নীলচে আলোয় আমি হারিয়ে যাওয়া পথের মাঝখানে,
ময়ূর পেখম সন্ধ্যার আশ্চর্য আগমন টের পেলাম!
লাল কৃষ্ণচূড়া বিছানো পথে,
হেঁটে হেঁটে নেমে আসা সন্ধ্যারা আমার কাঁধ ছুঁয়ে কতবার বলেছে,
'পাখি হলেই নীড়ে ফেরার তাড়া থাকতো,
এভাবেই বরং সব অনুভূতিরা ভালো!'

এসবের পর শুরু হয়ে যেত অজস্র
অজস্র কথোপকথন.....
কত শত চুমুক দিতে দিতে
দেখে নিতাম- কালো চোখ,
কাজলের টানা লাইনের কাছাকাছি
বিন্দু বিন্দু জমে ওঠা জল!
ঠিক, নাকের ডগায় ক্রমে ক্রমে বড় হতে থাকা
না বলা কত কত অভিব্যক্তি.....
হঠাৎ করেই যা নোনা জল ভেবে মুছে গ্যাছে
হাতের তালুর মধ্যে!

জানলা জুড়ে নেমে আসা, ময়ূরের কোবাল্ট ব্লু
ছাদ জুড়ে ওড়ানো ঘুড়ির গায়ে লেখা ছুটি!
চায়ের পেয়ালা একাই ঠোকাঠুকি করে,
গুণে গুণে ঠিক বেজোড় সংখ্যার চুমুকে
ঘন হয় আকাশ, জমা হয় একলা ভাসা মেঘ!
অথচ, আমরা জানতাম.....
নীড়ে ফেরার তাড়া কখনো ছিলনা, আমাদের!

রাস্তায় বেরুলে

রাস্তায় বেরুলে প্রায় নেতিয়ে পড়া বড় বড় গাছ চোখে পড়ে, এর মধ্যে আবার কোন কোন গাছের ডানপাশের সমস্ত ডালপাতা কাটা! অমন কাটা শরীরটা নিয়ে তবুও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কথা না বলা গাছগুলো!

রাস্তায় বেরুলে চোখে পড়ে মানুষের তাড়া, গাড়ির পেছন আরো গাড়ি। কত উৎকণ্ঠা নিয়ে মানুষ হেঁটে যায় শুধুমাত্র গন্তব্যে পৌঁছাবে বলে! এর মধ্যে ফুটপাথ ধরে চোখে পড়ে, ছোট্ট খুকি বাবার কড়ে আঙুল ধরে হেঁটেই চলেছে, এমন ভরসার ছায়াখানি পাশে থাকলে কি গন্তব্যে পৌঁছানোর তাড়া থাকে কারো!

রাস্তায় বেরুলে আরো দেখি, ধুলোর হুঙ্কার!
ধুলোর ঝাপটানো ঝড়ে চোখে জল আসে!
আমার আঙুল আলতো করে চোখের জল মুছতে গিয়ে টের পায়; রোদ নেই, ছায়া নেই এমন গোলকধাঁধা শহরে পাখিরা ডেকে ওঠে না, থাকে সাবধানে! গাছেদের ছেঁটে ছেঁটে ছোট করে যে ঝোপ আমরা তৈরি করেছি, তাতে পাখিদের অনন্ত পুচ্ছগুলো একদমই এঁটে ওঠে না!

রাস্তায় বেরুলে গাছেদের শরীরের মতো ডালপাতা মেলে দেয়া আমার মনের ধূসর মানচিত্রও ছোট হয়ে আসে, ধুলোর পরত জমে চোখের পাপড়িতে!
গাছেদের মতো নির্বাক হয়ে আমি প্রতিদিন মানিয়ে নেই সবকিছুতে, রাস্তায় বেরুলে!

সুরভী রায়
কবি, নাট্যকর্মী। সুরভী রায় ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এড করছেন। কবিতা লেখার পাশাপাশি নাটকে অভিনয় আর শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত।

সামাজিক দূরত্ব -২
আমান উল্লাহ
মাধ্যম: কাগজে এক্রিলিক রং
সাইজ: ৮ x ১০ ইঞ্চি

মায়া অ্যাঞ্জেলু

ভাষান্তর: বেনজামিন রিয়াজী

তবু জেগে উঠি

লিখতে পারো নাম আমার ইতিহাসে
তোমাদের তিক্ততম মিথ্যার বুননে,
দিতে পারো পায়ে দলে ময়লায় মিশিয়ে।
ধুলোর মতোই তবু, জেগে উঠবো পুনরুত্থানে।

আমার ঔদ্ধত্য কি ক্ষ্যাপায় তোমাকে?
প্রলিপ্ত হয়েছ কেন তুমি অন্ধকারে?
কারণ সদর্পে হাঁটি যেন বা পেয়েছি তেলকূপ
যেন হাতা চেপে তেল তুলি বসতের ঘরে।

ঠিক যেন চাঁদেদের সূর্যদের মতো,
ঢেউদের সুনিশ্চিত বেগে,
ঊর্ধ্বগামী আকাঙ্খার ঝাপটার মতোই
তবুও উঠবো আমি জেগে ।

দেখতে চেয়েছিলে নাকি আমাকে চূর্ণিত?
ন্যুব্জ-মাথা নিচু চোখ আনত বদনে?
কাঁধ ভেঙ্গে ঝরে পড়ছে যেন অশ্রুদানা,
নিস্তেজিত আত্মাছেঁড়া আমারই ক্রন্দনে।

আমার দুরন্তপনা করে নাকি তোমাকে আহত?
হয়োনা এসবে তুমি ভয়াল কঠোর
কারণ আমার হাসি দেখায় যে পেয়ে গেছি পিছন-উঠোনে
খনি খুঁড়ে তুলে আনা স্বর্ণের আকর ।

আমাকে বিদ্ধ করতে পারো তুমি ক্রুর শব্দ বাণে,
কেটে ছিন্ন করতে পারো তোমাদের চোখের চাকুতে,
আমাকে হত্যা করতে পারো তুমি ঘৃণার খঞ্জরে,
তবুও উদিত হবো বাতাসের অদম্য শক্তিতে।

আমার যৌবনশিখা তোমাদের বিচলিত করে?

সেকি আসে এমনই চমকে
যেন আমি নেচে চলি যেন বা হীরকরাজি পেয়ে গেছি
আমার এ উরুসন্ধিবাঁকে?

ইতিহাসে কলঙ্কিত আঁধার কুঠুরি ভেঙ্গে
আমি জেগে উঠি
শিকড়ে প্রোথিত বিষ-বেদনা-অতীত ফুঁড়ে
আমি জেগে উঠি
কালো মহাসমুদ্রের মতো আমি উদ্বেলিত আর প্রসারিত
ফুঁসে উঠি ফুঁসে উঠি জোয়ারে জোয়ারে প্রবাহিত।

ভয়াল করাল রাত্রি বিভীষিকা পিছে ফেলে
আমি জেগে উঠি
বিস্ময় জাগানো এক উজ্জ্বল প্রত্যুষ জ্বেলে
আমি জেগে উঠি
বয়ে নিয়ে উপহার রত্নরাজি পূর্বপুরুষের
স্বপ্ন আমি আশা আমি শৃঙ্খলিত কৃতদাসেদের।
জেগে উঠি আমি
জেগে উঠি
আমি জেগে উঠি ।

মায়া অ্যাঞ্জেলু
ভাষান্তর: বেনজামিন রিয়াজী

যখন পতিত হয় বিশাল বৃক্ষেরা

যখন পতিত হয় বিশাল বৃক্ষেরা,
দূরের পাহাড়ে শিলা কাঁপে থরথর,
সিংহেরাও গুটিসুটি বসে পড়ে
লম্বা-ঘাস ঝোঁপের ভিতর,
এমনকি হাতিরাও ছুটে চলে
গজমন্দ্রে সুরক্ষার খোঁজে ।

যখন বিশাল গাছ পড়ে যায়
বনের ভিতরে,
ক্ষুদ্র জিনিসগুলো কুঁকড়ে যায় শব্দহীনতায়,
তাদের চেতনারাশি
ক্ষয়ে যায় ভীতির ওপারে।

যবে মহান আত্মারা যায় মরে,
আমাদের চারিধারে বাতাসেরা হয়ে ওঠে
ভঙ্গুর, দুর্লভ, নিষ্ফলা।
আমরা সংক্ষেপে টানি শ্বাস।
আমাদের চোখ, সংক্ষেপে,
চেয়ে থাকে বেদনার্ত নির্মলতা নিয়ে।
আমাদের স্মৃতি, শাণিত হঠাৎ,
পরীক্ষায় নামে,
হানে দাঁত
প্রীতিময় না বলা কথায়,
কখনো হাঁটে না আর
প্রতিশ্রুত শপথের পথে।

মহৎ আত্মারা মরে যায় আর
জড়ানো তাঁদের সাথে আমাদের বাস্তবতা
আমাদের থেকে নেয় ছুটি।
তাঁদেরই যত্নে বেড়ে ওঠা
আমাদের প্রাণাত্মারা
সংকুচিত বিশীর্ণ এখন।
তাঁদেরই প্রভায় গড়া আর

জ্ঞানপ্রাপ্ত আমাদের মন
ক্রমশঃ ধূসর হয়ে যায়।
অন্ধকার শীতল গুহার
অবর্ণন অজ্ঞতার পথে
ক্ষয়ে ক্ষয়ে যেতে
আমরা মজিনি তবু ততো বেশী উদভ্রান্ততায়।

আর যবে মহান আত্মারা মরে যায়
ধীরে আর সর্বদাই এলোমেলো ভাবে
কিছুটা সময় পার হলে
শান্তির মুকুল ফুটে ওঠে,
শুশ্রূষার তড়িৎ-কম্পন এসে
শূন্যতাকে ভরে দিয়ে যায়।
যদিও আগের মতো নয় তবু
পুনর্লব্ধ আমাদের চেতনাসম্ভার
ফিসফিস কথা বলে আমাদের কানে।
ছিলেন তাঁহারা। ছিলেন তাঁহারা।
আমরাও থাকতে পারি। হতে পারি আরো
আরো ভালো। কারণ যে ছিলেন তাঁহারা।

মায়া অ্যঞ্জেলু
ভাষান্তর: বেনজামিন রিয়াজী

আমি জানি কেন সেই খাঁচার পাখিটি গান গায়

মুক্ত পাখি লাফ দিয়ে বাতাসের পিঠে চেপে বসে
ভেসে যায় ভাটি স্রোতে প্রবাহের শেষান্ত অবধি
ডুবায় পাখনাগুলো রোদ্দুরের কমলা রশ্মিতে
এবং দর্পভরে করে এই আকাশটা দাবি।

কিন্তু এক বন্দী পাখি গুটিসুটি সংকীর্ণ খাঁচায়
কদাচিৎ দৃষ্টি তার যায় ক্রুর শিকের ওপারে
ডানাগুলো আঁটাছাঁটা বেঁধে রাখা পাগুলো শিকলে
তাই সে কণ্ঠ তার খুলে দেয় গান গা'বে বলে।

খাঁচার পাখিটি গায় গান তার ভয়ার্ত গমকে
অচেনা জিনিস নিয়ে কিন্তু যা সে আজো চায় পেতে
এবং রাগীনি তার শোনা যায় দূরের পর্বতে
কেননা খাঁচার পাখি গান গায় মুক্তিকামীতার

মুক্ত পাখি চিন্তা করে অন্য এক মলয়সমীর
এবং আয়নবায়ু মৃদুমন্দ হতাশ্বাস বৃক্ষদের মাঝে
এবং অপেক্ষারত হৃষ্টপুষ্ট পোকাগুলো আলোকিত ভোরের উদ্যানে
এবং আকাশটাকে লিখে নেয় তার নিজ নামে।

খাঁচার পাখি সে কিন্তু খাড়া ঠায় স্বপ্নদের অন্তিম কবরে
ছায়া তার আর্তনাদে দুঃস্বপ্নের ভয়াল চিৎকারে
ডানাগুলো আঁটাছাঁটা বেঁধে রাখা পাগুলো শিকলে
তাই সে কণ্ঠ তার খুলে দেয় গান গা'বে বলে

খাঁচার পাখিটি গায় গান তার ভয়ার্ত গমকে
অচেনা জিনিস নিয়ে কিন্তু যা সে আজো চায় পেতে
এবং রাগীনি তার শোনা যায় দূরের পর্বতে
কেননা খাঁচার পাখি গান গায় মুক্তিকামীতার।

আত্মশ্লাঘা

মায়া অ্যাঞ্জেলু
ভাষান্তর: বেনজামিন রিয়াজী

আমাকে বাড়িয়ে দাও হাত
কবিতার অনল-গরল পিছে ফেলে
তোমাকে এগিয়ে নিতে আর
তোমার অনুসরণে যেতে
আমার জন্য গড়ে দাও পরিসর।

অন্য সবাই নিয়ে যাক
মর্মছোঁয়া শব্দদের
একান্ততা
আর প্রেম
প্রেম হারাবার।

আমার জন্য শুধু
আমাকে বাড়িয়ে দাও হাত।

মায়া অ্যাঞ্জেলু
ভাষান্তর: বেনজামিন রিয়াজী

সময় ক্ষেপণ

তোমার ত্বকের রঙ ভোরের মতোন
আমার যেন বা ছায়াঢাকা

একটি চিত্রিত করে
সুনির্দিষ্ট সমাপ্তির শুরু ।

আরেকটি, নিশ্চিত শুরুর
সমাপ্তিকা ।

মায়া অ্যাঞ্জেলু (১৯২৮–২০০৪) আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আমেরিকান কবি, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, আত্মজীবনীকার ও নাগরিক অধিকার কর্মী। এছাড়াও তিনি ছিলেন গায়িকা, সুরকার, নৃত্যশিল্পী, অভিনেত্রী, টিভি উপস্থাপিকা ও হলিউডের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী চিত্র পরিচালক। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত রচনা I Know Why The Caged Bird Sings প্রকাশিত হলে তিনি এক খ্যাতিমান কবি হিসেবে পরিচিতি পান। বইটি black feminist movement কে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর আরেক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ Still I Rise প্রকাশ পায়। তাঁর দীর্ঘ জীবনের বিচিত্র বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শৈল্পিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে বৈষম্যপীড়িত সমাজচিত্র কে এক তীব্র আশাবাদী ও দ্রোহের সুরছন্দে প্রকাশ করেছেন। শৃঙ্খলিত, পরাধীন কালো মানুষের উপর সীমাহীন নিপীড়ন-নির্যাতন, উপেক্ষা ও বৈষম্যের প্রতিবাদে এবং একজন নারী হিসেবে লিঙ্গ-বৈষম্যের বিপরীতে তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন।

বেনজামিন রিয়াজী
কবি, চিত্রকর, অনুবাদক। বেনজামিন রিয়াজীর জন্ম রাজশাহীতে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে প্রশাসনে কর্মরত।
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ:
দহনের প্রতিসাম্যে
অন্তিম আঁধার ভেঙ্গে
পাখিদের শেষ কথা
গীতসংহিতা
বধ্যভূমে নির্বিকার
অসহ কুহক ও কিছু নির্বাচিত কবিতা

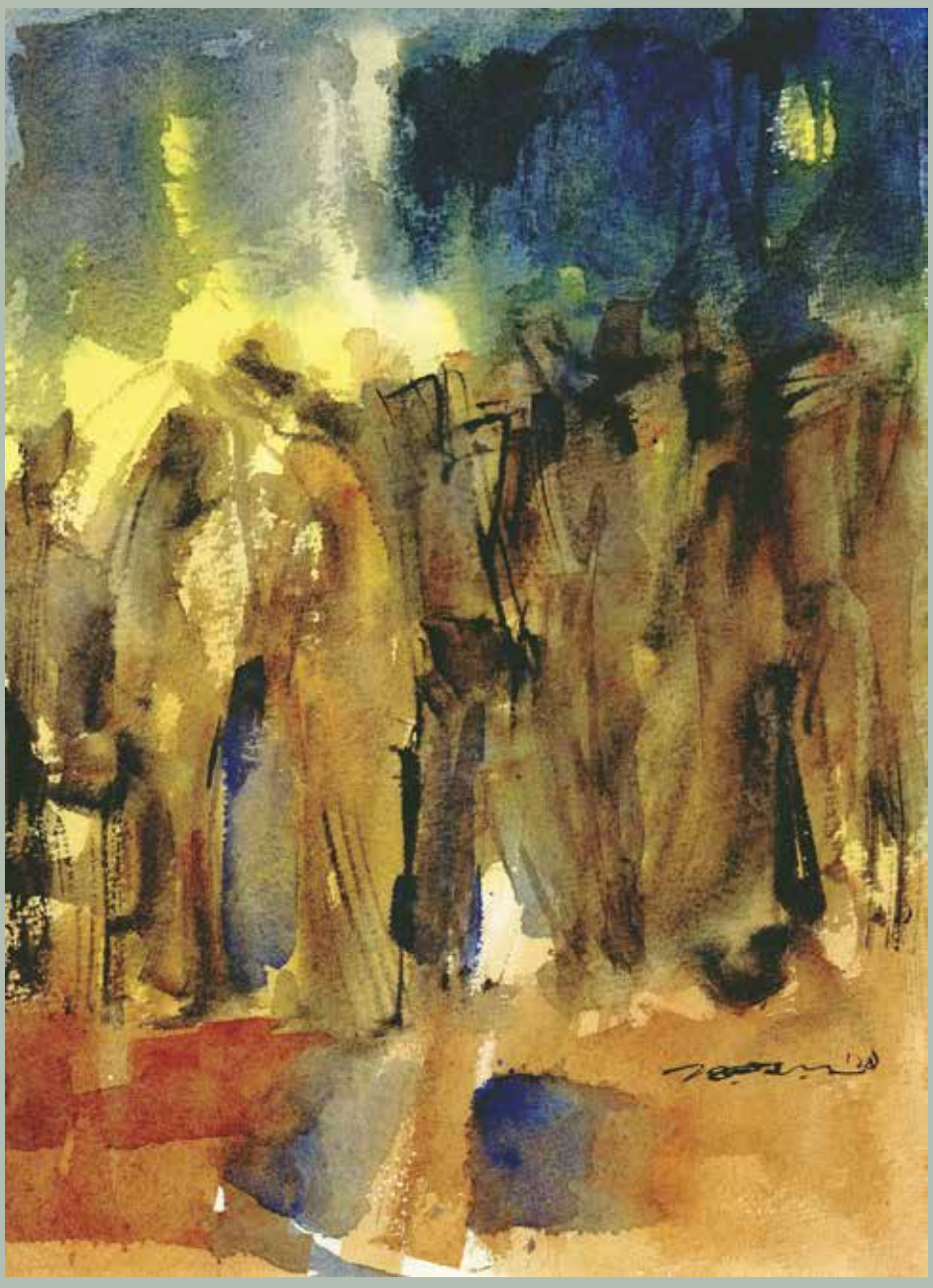

কোলাহল
হিরন্ময় চন্দ
মাধ্যম: কাগজে জল রং
সাইজ: ১১ইঞ্চি x ১৪ইঞ্চি

দারীন তাতুর
ভাষান্তর: মাজহার জীবন

কবিতার কারাবন্দী

একদিন,
তারা আমাকে থামালো
শেকল পরালো আমার পায়ে
ওরা আমার শরীর বাধলো, বাঁধলো আমার আত্মা
বাধলো আমার সর্বস্ব-----

তারপর তারা বললো:
'ওকে তল্লাসী করো,
ওর ভেতরের সন্ত্রাসীকে খুঁজে বের করবো আমরা!'
ওরা আমার হৃৎপিণ্ড খুবলে বের করে আনলো
উপড়ে নিল চোখ;
এমনকি তছনছ হওয়া থেকে রেহাই পেল না আমার অনুভূতিও।
আমার চোখ দুটোয় তারা পেল প্রেরণার স্পন্দন;
হৃদয়ে পেল সংকল্প ধারনের ক্ষমতা।
তারপর আবার হুংকার দিলো : 'হুশিয়ার!
পকেটের মাঝে ও অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে।
ওকে তল্লাসী করো!
বিস্ফোরকটা বের করে আনো।'
আর তাই ওরা আমাকে আবার তল্লাসী করলো------
অবশেষে আমাকে অভিযুক্ত করে তারা বলল:
'কতকগুলো অক্ষর আর একটা কবিতা ছাড়া
ওর পকেটে কিছুই পাইনি আমরা।'

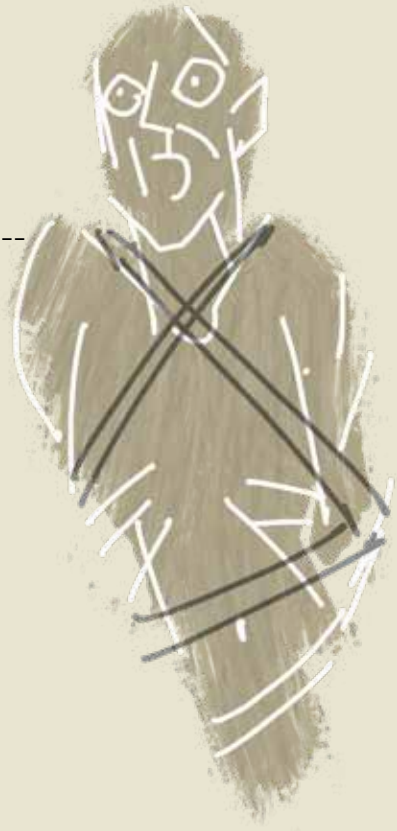

চাইছো তাই ভুলে যাব

দারীন তাতুর
ভাষান্তর: মাজহার জীবন

চাইছো
তাই ভুলে যাব
আমাদের গল্প যা অতীত এখন
আমাদের স্বপ্ন যা আমাদের হৃদয় ভরিয়ে দিত
সেই স্বপ্ন সেই অতীত যদি সত্য হতো!
কিন্তু তারা যে নিহত হলো আমাদেরই হাতে।
সব ভুলবো আমি, ও আমার জীবনের ভালবাসা!
যা কিছু বলেছি আমরা
আমাদের হৃদয় দেয়ালে লিখেছি যে কবিতা,
রঙে রঙে এঁকেছি যে ছবি
ক্ষণিক বসেছি যে বৃক্ষের ছায়াতলে
আঁচড়ে আঁচড়ে লিখেছি যে নাম
সব ভুলবো আমি।

চাইছো
তাই ভুলে যাব
রাগ করো না তবে।

দারীন তাতুর ফিলিস্তিনি কবি ও ফটোগ্রাফার। জন্ম ইজরাইলের রেইনেহ শহরে ১৯৮২ সালে। ফিলিস্তিনি জনগণের মুক্তির পক্ষে ২০১৫ সালে ফেসবুকে প্রকাশিত **'প্রতিরোধ করো জনতা, ওদের প্রতিরোধ করো' নামক** কবিতা প্রকাশের অপরাধে ইজরাইলী সরকার তাঁকে জেলে দেয়। তাঁকে ২০১৫ সালের অক্টোবরে গ্রেফতার করে তিন মাস জেলে রাখা হয়। তারপর ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে প্রায় আড়াই বছর নানাবিধ বিধিনিষেধসহ তিনি গৃহবন্দী ছিলেন।

মাজহার জীবন
সম্পাদক লেখালেখির উঠান (www.uthon.com)। সমন্বয়কারী মাসিক জ্ঞাতিজন আড্ডা, লালমাটিয়া, ঢাকা। প্রকাশিত বই:
১. বাংলাদেশের দলিত সমাজ: বৈষম্য, বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতা (সহলেখক আলতাফ পারভেজ) ২. Diaspora Philanthrophy in Bangladesh (সহলেখক রাশিদা আহমেদ ও সাফি রহমান খান) ৩. বরেন্দ্রী আদিবাসীদের চালচিত্র (সহলেখক সারওয়ার-ই- কামাল ও বারেক হোসেন মিঠু) ৪. বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানশিক্ষা (সহলেখক আলতাফ পারভেজ ও বারেক হোসেন মিঠু)

সামাজিক দূরত্ব -৩
আমান উল্লাহ
মাধ্যম: ক্যানভাসে এক্রিলিক রং
সাইজ: ৩৬ x ৩৬ ইঞ্চি

গল্প

শুভ পরিচয়

কল্যাণী রমা

(এক)

আবার অপেক্ষা করছি। কিসের এত অপেক্ষা আমার? এ কোথায় শুয়ে আছি? কোনও এক জলপ্রপাতে কি? কি জানি হয়ত আসলেই জলপ্রপাত!

বামদিকের জানালা দিয়ে খুব অল্প আলো ঢুকছে ঘরে! জানালাগুলো সব সময় বামদিকে হয়! কে জানে হয়ত বামদিকে, ঘরেরও একটা হৃদয় থাকে।

চোখ বন্ধ। কোনকিছুই খুব ভাল বুঝতে পারছি না। আসলে চোখ খুলে জলপ্রপাত দেখে ফেলব ঠিক অতটা সাহস নেই আমার।

অপেক্ষা করছি।
পায়ে পা পেঁচিয়ে খুব বেশী রকম চাচ্ছি একদম ভেসে যেতে। অনেক জলের ভিতর। থরথর করে কাঁপছে শরীর। আমার হাতের এবং পায়ের পাতাগুলো শাদা কঙ্কালের মত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। ঠোঁট আর ভেজা নয়। গলা শুকিয়ে কাঠ।

আর কিছুতেই কিছু সহ্য করতে পারছি না। কেন এত কষ্ট হচ্ছে? দম বন্ধ হয়ে আসছে। আর অল্প অপেক্ষা করলে আমি জানি একদম ঝুরঝুর করে ভেঙ্গে পড়বে আমার পুরো কঙ্কাল শরীর। অমনই তো সবসময়। মানুষকে মুঠো করে যত জোরে চেপে ধরতে যাই, সে তো আঙুলের ফাঁক দিয়ে বালুর মতই ঝরে পড়ে।

কনভেয়ার বেল্টের উপর দিয়ে যৌবনটা চলেছে...মনে হ'ল উপর থেকে গিলোটিন-এর ব্লেড নেমে আসবে এখনি - অসফলতার মত!

কিন্তু যখন ভাবছি আর কিছুই হ'ল না, ঠিক তখন সমস্ত আমাকে ভাসিয়ে ভীষন জোরে শাদা জল উত্তর গোলার্দ্ধ থেকে দক্ষিন গোলার্দ্ধ পর্যন্ত নেমে আসল। অসম্ভব সাদা ওই কালো জল। কোনমতে দু'হাতে পাহাড় জড়িয়ে আমি নামতে থাকলাম। কোন পুরাতন বৌদ্ধ স্তুপের অসংখ্য সিঁড়ির ধাপ বেয়ে বেয়ে। ছোট, ছোট বেগুনি ফুল ভাসছে জলের উপর। ফুলের নাম জানি না।

এবং হঠাৎ দেখি জানালা দিয়ে অনেক আলো এসে এক লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে। আসলে ওগুলো আলোর ধুলো। মিছিল করে একটু সুযোগ পেলেই একেবারে অস্তিত্বের ভিতর ঢুকে পড়ে। ভাঙ্গাচোরা ছোট, ছোট স্বপ্নের মত। শরীরটাকে ফেলে রেখে আকুল হয়ে কোনমতে বাইরে তাকিয়ে দেখি, 'ওমা, একি! পাশের মরা রেডবাড গাছটা পেঁচিয়ে অনেক নীল রঙের মর্নিং গ্লোরি ফুটে আছে। কোন কুয়াশা নেই। ভোর হয়ে গেছে।'

এদিকে নিজের দিকে তাকিয়ে সে তো আর এক কান্ড! আমি তো জেগেই আছি পুরো জীবন কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে। তবু কোন কারণ ছাড়াই অসম্ভব জোরে কেন যেন ঘড়ির এলার্ম বেজে উঠল। আহা রে, জীবনটাতে কারখানার মত কেবলই ঘন্টা বেজে চলেছে। পড়িমরি নামতে গেলাম বিছানা থেকে। কোথায় স্যান্ডেল কোথায় কি। হোঁচট খেয়ে পড়লাম।

কোনমতে নিজের শরীর, মন সব সামলে রান্নাঘরের দিকে দৌড় দিলাম। জলখাবার বানাতে হবে। বাচ্চা দু'টোর স্কুলের লাঞ্চ। স্নো-প্যান্ট, স্নো-বুট, মিটেন, টুপি, ডাউন কোট – কিচ্ছু ভুল করা যাবে না। চারিদিকে এত বেশী সাদা বরফ জমে আছে! ওদের সোনালি চুল, নীল চোখ, আমারগুলোর কালো...লাল, নীল টুপি – বরফের উপর ওটুকুই তো রঙ।

(দুই)
কি অসম্ভব পাপহীন সকাল! স্মৃতিবন্ধী শিশুর মুখের মত। আমি ভাবলাম কি জানি হয়ত বরফ গলে গেছে। বাইরে ঘাসে পা ডুবিয়ে একটু হাঁটি। অনেক হলুদ রঙের ড্যানডিলাইন ফুটে আছে। সাদা, সাদা ক্লোভার। শিশিরে ভেজা পা নিয়ে কি করব ভাবছি, ঠিক তখন দেখি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলে তুমি। হঠাৎ। এমনও হয় নাকি?

এবং এসেই কথা নেই বার্তা নেই, বলতে শুরু করে দিলে, 'এমন বাচ্চা মেয়ের মত কাঁদছিস কেন রে, সোনামনি?' আমি যে আসলে ঘরের দরজা বন্ধ করে সত্যিই ভীষণ রকম কাঁদছিলাম – তোমাকে কে যে সেই খবরটা দিল?

অথচ এমন তো সকলেরই হয়। খুব ছেলেবেলায় স্বপ্ন থাকে। আর বড়বেলাতে -স্বপ্নের মরে যাওয়া। নতুন কোন গল্প তো নয়। বুকের কাছটা ব্যথা করে। গলার কাছটা ধরে আসে। বাচ্চা-কাচ্চা মানুষ করতে করতে তারপর একসময় সবকিছু সয়ে যায়।

আমি হাঁটছি। একা। কেননা কাশফুলের ভিতর দিয়ে তোমার হাত ধরে হেঁটে যাওয়ার মত ঠিক অতটা জায়গা নেই। জীবনের পথগুলো খুব চওড়া তো আর হয় না!

তবু তুমি অকারণেই বলে চলেছ, 'ছেলেবেলা ছাড়া আর কিছুই নেই আমাদের। একসাথে। তাই সেটুকু আর কিছুতেই ভোলা গেল না। কত বৃষ্টি হল তারপর – তবু!

একবার শুধু দেখা হয়েছিলো। কি একটা অকাজে ব্যস্ত ছিলে তুমি। পাড়ার বন্ধুরা অপেক্ষা করছিলো, তোমারও যাবার তাড়া ছিল। কি জানি হয়ত কৃষ্ণচূড়ার খোদলে দোয়েলের বাসা খুঁজে পেয়েছিলে। বাসায় নতুন বাচ্চা, একটা না ফোটা ডিম। মা পাখিটা মারা গেছে। নতুন জীবনের নেশা মরণের থেকে সবসময়ই অনেক শক্তিশালী হয়।

এত দিন পর আবার তোমাকে দেখে ভীষণ হাসি পেল আমার। কি একটা চেহারা সত্যি! বড়, বড় চোখ। এলোমেলো চুল বাতাসে উড়ছে। শাদা স্যান্ডো গেঞ্জির কোচর ভরে শিউলি ফুল। হাফ প্যান্টটা হাঁটুর উপর। ধুলো ভর্তি খালি পা। দৌড়াচ্ছো। বাসাতে ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। নয়ত ফুলগুলো শুকিয়ে যাবে।

কি করবে অত ফুল দিয়ে? ছেলেরা কি মালা গাঁথে, পুতুল খেলে, কিংবা রান্নাবাটি? কিন্তু তুমি আবার এমনই মেয়ে, মেয়ে ধরণের একটা ছেলে যে সব খেলে বসে আছ। দৌড়ে ফার্মগেটের কাছের ওই রেললাইনের কাছে যাচ্ছ। দশ পয়সা ছুঁড়ে দিয়েই ভোঁ দৌড়। আর ট্রেন চলে গেলেই জীবনের সব দশ পয়সাগুলো চ্যাপ্টা হয়ে গিয়ে রুপালি রাংতা।

এক নম্বরের বোকা তুমি। কি করবে বলো তো ঐ সব ট্রেনের নীচে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া দশ পয়সাগুলো দিয়ে? ওই রাংতা দিয়েই কি মুকুট বানাবে নাকি আমার? সব বুঝি জমিয়ে রেখেছো – এই এত্ত দিন ধরে?

হায় রে, কি ভাবে বোঝাই তোমায়, ছেলেদের এক্কেবারে ওমন হতে নেই। ছেলেদের পকেট ভর্তি থাকতে হয় ডাংগুলি, গুলতি, চকমকে তলোয়ার, এক কোপে যেন সব দৈত্য দানোদের মুন্ডু কেটে ধুন্ধুমার কান্ড বাধিঁয়ে দিতে পারে! তা না, গেঞ্জির কোচর ভরে শিউলি ফুল কুড়িয়েছো। সারা ছেলেবেলা। পুরোটা জীবন।

এমন ছেলে দিয়ে কি করব আমি বলো তো?

একদম অকেজো।

(তিন)

আমি হাঁটছি। কেবলই হাঁটছি। কেননা পথটা এমনই যে হাঁটলে ফুরাবে না। না হাঁটলেও ফুরাবে না। পৃথিবীটা সত্যি কত ছোট। তবু আমি যেখানে যেতে চাই, যাদের কাছে থাকতে চাই, সেই পথ ঈশ্বরের থেকেও অজানা। সেই পথ তাই কোনদিনই ফুরায় না।

পথের পাশে শুধু পড়ে থাকে কিছু সবুজ রঙের ডোবা। শ্যাওলা পড়া জল। মরচে পড়া জল। মরুভূমির জল। সব না পাওয়া স্বপ্নের মত। যেন ওদের কোথাও যাওয়ার নেই। সবাই ওদের কেন যেন ভুলে গেছে। ওরা শুধু পড়ে থাকবার জন্য। জলে মরচে পড়ে নাকি জলই মরচে পড়ায়?

কিছু প্রশ্ন থাকে যার উত্তর হয় না। কিছু উত্তর থাকে যা মরলোকের মত শুধু ভাসতে থাকে। ঠিক ডোবাগুলোর জলের উপরে। এতটাই নীচে নেমে আসে যে মনে হয় হাতটা একটু বাড়ালেই হয়ত সব ছোঁয়া যাবে। তবু সব প্রশ্ন আর উত্তরগুলো ভুলে যাওয়া ছেলেবেলার গ্রামের পথে, শীত সন্ধ্যার ধোঁয়া হয়ে আজন্ম বেঁচে থাকে। কিছুই আর পাওয়া হয় না।

কল্যাণী রমা

গল্পকার, অনুবাদক। জন্ম ঢাকায়। ছেলেবেলা কেটেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ভারতের খড়গপুর আইআইটি থেকে ইলেকট্রনিক এ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কমুনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং-এ বি টেক করেছেন । এখন আমেরিকার উইস্কনসিনে থাকেন। অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সিনিয়র ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে কাজ করছেন ম্যাডিসনে।

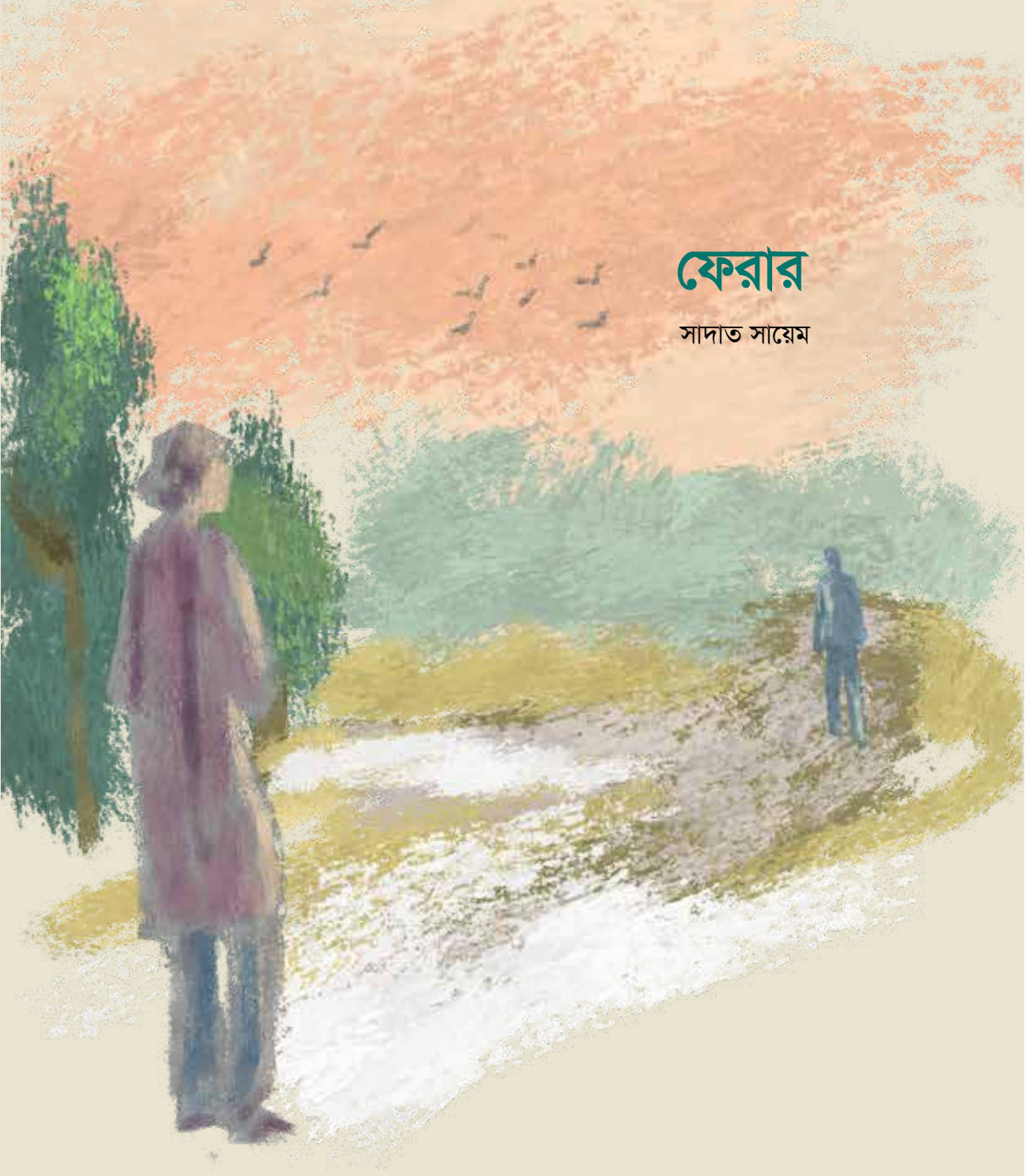

ফেরার

সাদাত সায়েম

পাখিদের কলরব এই পানিছত্র গ্রাম তো গ্রাম, গ্রাম ছাড়িয়ে ধানী জমির বিস্তার আর গ্রামের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটাকে পর্যন্ত একটা বিন্দুতে টেনে আনলে আশা কথা বলে উঠল:

– কালকেই চলে যাচ্ছিস?

– হ্যাঁ।

– আবার কবে আসবি?

– দেখি!

আশাদের বাড়িটা ছিল রাস্তার ঠিক পাশে, তবে বাড়ির সামনে ছিল একটুখানি ফাঁকা

জায়গা, তারপর রাস্তা বরাবর কলাগাছের সারি। আশা আর পাভেল ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে ফাঁকা জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।
পাভেল রাস্তায় উঠে আসার জন্য পা বাড়ালে, আশা আবার কথা বলে উঠল:
– সুনীলের বইটা কিন্তু মনে করে নিয়ে আসিস্।
হালকা বাতাস উঠল চরাচরে, কলাগাছের পাতায় মৃদু কাঁপন তুলে মিলিয়ে গেল।
– কোন বইটা রে?
– ভুলে গেলি! সুনীলের 'রূপালী মানবী'। পরশু না বললি যশোর থেকে এনে দিবি।
– আচ্ছা, ঠিক আছে। আনব।
পাভেল আর দাঁড়ালো না। আশা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল তাদের বাড়ির সামনে। আশাদের বাড়িটার পরপরই শুরু হয়ে গেছে ধানী জমির বিস্তার। সেখানে এখন পাকা ধান। আশা কান পেতে রাস্তায় পাভেলের পদক্ষেপ গুনল আর পাখিদের কোলাহল শুনল। তারপর লুকানো একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুক ঠেলে বের হয়ে আসল। না, পাভেলকে সে এখন আর একেবারেই বুঝতে পারছে না!

পাভেল হাঁটতে থাকল রাস্তাটা ধরে, যা কিনা এই নিবিড় গ্রামটাকে দূর জগতের সাথে সম্পর্কিত করেছে। পাভেল ভাবছিল এই সম্পর্কটা থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায়। না, গ্রামটার সাথে বাহিরের জগতের সম্পর্ক থেকে নয়। সে ভাবছিল আশার কথা। এই যে লতার মতো বেড়ে উঠা মেয়েটা তাকে আঁকড়ে ধরছে, তার পরিণতি নিয়ে সে ভয় পায়। সে প্রায়ই এমনটা ভাবে, কিন্তু অমোঘ নিয়তির মতো সে আরও বেশি জড়িয়ে যায়। এই যে জড়িয়ে যাওয়া তা তো দ্বিপাক্ষিক, ফলে আর মুক্তি মেলে না। কী দরকার ছিল বইটার কথা বলার। সে যশোর এমএম কলেজে ইন্টারমেডিয়েট-এ ভর্তি হবার পর বইটা কিনেছে। খড়কি এলাকায় যে ভাড়াবাসাটায় সে থাকে সেখানে আশেপাশে তার পরিচিত কেউ নেই। তাই সে বেশির ভাগ সময় বই পড়ে কাটায়। না, পাঠ্যবইয়ের প্রতি তার কোন কালেই উৎসাহ ছিল না। তাই সে রাজ্যের 'আউট' বই জড়ো করেছে। না, না, এইসব বই-টই আশাকে পড়তে দেয়া উচিৎ হবে না। ওকে তার জীবনের সাথে আর জড়াতে চায় না সে। এই ভেবে সে একটু স্বস্তি পেল, তার মন খানিকটা স্থিরতা পেল, আর তার কানে আবার ভেসে এলো পাখিদের কলরব, কিন্তু এখন অনেক মৃদু– যেন ঘুমিয়ে পড়ার আগে বিড়বিড়।
– কী রে কতক্ষণ ধরে তোর পেছন পেছন আসছি! তোর তো কোন হুশ নাই!
– আরে, জলিল, তুই!
– আমি দেখলাম তুই আশাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে মাথা নিচু করে হাঁটছিস।
– ও আচ্ছা।
– তুই কী নিয়ে এতো চিন্তিত?
– ব্যাপার একটা আছে, দোস্ত!
– চল, আমাদের বাড়িতে চল। আমার ঘরে বসে দুই বন্ধুতে মিলে গল্প করব। তুই তো বাড়িতে আসতেই চাস্ না।
জলিলের জীবনটা বড় অদ্ভুত। সৎমা যে কারো কারো জীবনে বিপর্যয় হিসাবে দেখা দিতে পারে জলিল তার উদাহরণ। তার আপন মা যখন মারা যায়, তখন জলিল এতো

ছোট ছিল যে পাড়ার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে পুকুরে নেমে গিয়েছিল আনন্দ করতে। আর এখন সেই কথা ভেবে মনে খুব ব্যাথা পায়। দোস্ত, তখন কেন আমি এ রকম করেছিলাম! বন্ধুরা ওকে বলে, তখন তুই বুঝতি নাকি! তুই ছোট ছিলি। ওর সৎমাকে কখনও ওর সাথে ভালো ব্যবহার করতে দেখেনি পাভেল। জলিল একটা আলাদা ঘরে থাকত, ভেতর-বাড়িতে তেমন যাতায়াত করত না। খাবার সময় হলে তার সৎবোন খাবার দিয়ে যেত। আর এই ঘরটাতে বসে বসে জলিল রাজ্যের জিনিষ কল্পনা করত। আর সুযোগ পেলেই তার সাইকেলে চেপে ছুটত উপজেলা সদরে সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে। আর অবসরে সিনেমার চিত্রনাট্য লিখত। সে ভাবত একদিন তার চিত্রনাট্য চিত্রপরিচালকেরা লুফে নেবে আর সেগুলোর উপর ভিত্তি করে নির্মিত হবে দারুণ দারুণ সব চলচিত্র। ছুটিতে পাভেল বাড়িতে এলে সে পাভেলকে চিত্রনাট্যগুলো দেখাত। তার সব চিত্রনাট্য জুড়ে থাকত মায়ের ভালোবাসার জন্য হাহাকার, আক্ষেপ।

– হারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে দে। আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।

– শহরে গেছিস্ এই তো সেদিন। এরিমধ্যে চোখ নষ্ট করে ফেললি।

– আরে না, তোর ঘরে কী পানি এনে রাখিস্?

– তা তো রাখি! শুধু খাবার গুলো শরীফা এসে দিয়ে যায়।

– শরীফা এখন কোন ক্লাসে রে?

– ক্লাস এইট। ওর মা যে আমাকে ভীষণ অবহেলা করে তাই সে মনখারাপ করে।

– তাহলে খারাপ সৎমা পেলেও ভালো সৎবোন পেয়েছিস্!

– হ্যাঁ, বন্ধু। তা পেয়েছি। অন্যমায়ের পেটে হোক, বোন তো! আমার কথা তো অনেক জানলি, এবার তোর কথা বল শুনি, শহরের কথা বল।

– আসলে আশার ব্যাপারে আমি চিন্তিত।

– আশাকে নিয়ে চিন্তার কী আছে, বন্ধু? ও তো তোকে খুব পছন্দ করে। সেদিনও শরীফার কাছে জানতে চেয়েছিল আমার সাথে তোর যোগাযোগ আছে কিনা, কবে আসবি আমি জানি কি না এইসব।

– এইজন্যই তো বেশি চিন্তা। এই যে জড়িয়ে যাওয়া এটা কি ভালো?

– কী বলছিস্! তোরা একসাথে দীঘির জলে সাঁতার কেঁটে কেঁটে বড় হলি, আর এখন বলছিস্ জড়িয়ে যাওয়া ভালো না!

– তুই কি কখনও চাইবি তোর সাথে আমার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাক?

– তোর কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা রে! এখানে তোর-আমার বন্ধুত্ব নষ্ট হবার প্রসঙ্গ আসছে কিভাবে?

– আমি উদাহরণ দিলাম। কিন্তু আমি বোঝাতে চাচ্ছি আমার বাবা আর আশার বাবার বন্ধুত্বের কথা।

– কি বলছিস্! উনারা কি তোদের সম্পর্ক মেনে নেবে না?

– না।

বেশ জোরের সাথেই 'না' শব্দটা বলল পাভেল। তারপর উঠে দাঁড়াল আর ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। পাভেলকে এভাবে চলে যেতে দেখে জলিল অবাক হয়ে জানতে চাইলঃ

– কিরে চলে যাচ্ছিস্! পানি খেতে চেয়েছিলি, পানি খাবি না?
পাভেল আর একটা কথাও না বলে জলিলের ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তারপর আর সাতবছর বাড়িতে ফিরল না। এমন কি সে যশোরেও গেল না। সে কোথায় লাপাত্তা হয়ে গেলো কেউ হদিস দিতে পারল না। শুধু পানিছত্র গ্রামকে যে রাস্তাটা দূর জগতের সাথে সম্পর্কিত করেছে, তা একজন মানুষের ফেরার হবার সাক্ষী হয়েছিল।

সাতবছর পর সে যখন গ্রামে ফিরে এলো, তখন সে জানতে পারল আশার বিয়ে হয়ে গেছে বছর দুই আগে, পার্শ্ববতী গ্রামের আকবর আলির সাথে। আকবর যশোর শহরে ব্যবসা করে। সে বেশ অবস্থাপন্ন। আশা এখন যশোরেই থাকে। ফলে পাভেলের সামনে আবার ফেরার হওয়ার কারণ হাজির হলো।
– কি মিয়া, বাড়িতে মন টিকল না? এতো তাড়াতাড়ি আবার ফিরে আসলা যে?
– হ্যাঁ, চাচাজি, বাড়িতে মন টিকল না।
দোকানটাতে ভীড় লেগে থাকে সমসময়। হাশিম মুন্সী, পাভেল যাকে চাচাজি বলে ডাকত, ধোবাউড়া উপজেলা সদরের বাজারে চা-নাস্তার দোকানটা দিয়েছিলেন। একসময় সমবায় অফিসে ছোটখাট পদে চাকরি করতেন। চাকরি থেকে অবসরের পর দোকানটা দিয়েছিলেন। বেশ চালু দোকান। সবসময় মানুষজনের আনাগোনা। রুটি, সবজি, পরোটা, ডিমভাজা আর চা খাওয়ার জন্য ভোরবেলা থেকে শুরু করে মাঝরাত পর্যন্ত ক্রেতাদের আনাগোনা থাকে। যশোরের দূর পানিছত্র গ্রাম থেকে পাভেল কিভাবে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলা সদরে হাশিম মুন্সীর চা-নাস্তার দোকানে হাজির হয়েছিল তা এখন এমনকি পাভেলেরও আর তেমন স্পষ্ট মনে পড়ে না। পাভেলের কাজটা শুধু দুবেলা রুটি, পরোটা বানানো। তার ছোটবেলা থেকেই রান্নার বিষয়ে আগ্রহ ছিল, ফলে মায়ের কাছ থেকে নিজেই কাজটা শিখেছিল। রুটি-পরোটা বানানোর সময়টা ছাড়া বাকি সময় সে বই পড়ে কাটাতো। কবিতা, গল্প, উপন্যাস পড়ত। হাশিম মুন্সী পাভেলকে স্নেহ করতেন।
– পাভেল মিয়া, প্রাইভেটে এইচ.এস.সি পরীক্ষাটা দিয়ে দাও। দোকানে রুটি-পরোটা বানাইবা আর বাকি সময়টা পড়বা। পাশ দিয়া দিবা ইনশাল্লাহ্। তুমি তো বাবা গুণী ছেলে, গুণটা কাজে খাটাও। দিনা তো এইবার এইচ.এস.সি দিচ্ছে। কিছু সহযোগিতা তো তার কাছ থেকেও পাইবা। মা তো আমার ভালো ছাত্রী।

দিবে না দিবে না করতে করতে শেষ পর্যন্ত পাভেল ধোবাউড়া কলেজে প্রাইভেটে মানবিক বিভাগ থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিয়ে ফেলল, পাশও করে ফেলল। আর ধোবাউড়া মহিলা কলেজ থেকে দিনা বিজ্ঞান বিভাগে ভালো ফলাফল নিয়ে পাশ করল।
– পাভেল ভাই, আপনি তো অল্প কয়েকদিন পড়েই পাশ করে ফেললেন! বি.এ ভর্তি হয়ে যান।
– দিনা, তুমি যে নোটপত্র সংগ্রহ করে দিয়ে সহযোগিতা করেছ, সেজন্য হাজারো ধন্যবাদ। হ্যাঁ, বি.এ ভর্তি হব। আর তোমাকে কিন্তু অনেক দূর যেতে হবে। তোমার বাবা তো তোমাকে নিয়ে অনেক গর্ব করেন।
– পাভেল ভাই, দোয়া করবেন যেন আমি বাবার মুখ উজ্জ্বল করতে পারি।

কিন্তু পাভেল আর দিনার এই সহজ সম্পর্কে অচিরেই নেমে এলো অন্ধকার। এলাকার একদল কুটিল হিংসুটে লোক রটিয়ে দিলো হাশিম মুন্সীর মেয়ের সাথে পাভেলের গভীর প্রেম চলছে। তারা হাশিম মুন্সীকে হুমকি দিতে শুরু করল সে যেন তাড়াতাড়ি দুইজনের বিয়ে দিয়ে দেয়, না হয় তারা সালিশি ডাকবে।

– পাভেল মিয়া, এখন কী করা? আমার মেয়েটার নামে তো ওরা যা-তা ছড়াচ্ছে।

– চাচাজি, ওরা ওসব করছে হিংসা থেকে। ওরা চায় না আপনার মেয়ে আরো সামনে এগিয়ে যাক। মেয়ে হয়ে উপজেলার সেরা ফলাফল করেছে, ওদের সহ্য হচ্ছে না।

– পাভেল মিয়া, আমার মাথায় কোনও বুদ্ধি আসছে না। তোমাকে আমি স্নেহ করি, ভালো ছেলে হিসাবে জানি। তুমি না হয় দিনাকে বিয়ে করে ফেল, মেয়েটা আমার কলংক থেকে বাঁচুক।

– চাচাজি, এতে তো কলংক থেকে মুক্তি পাওয়া হবে না, বরং তা হবে ওরা যা বলছে আর চাচ্ছে তা মেনে নেওয়া।

– আমি যা বলছি তাই কর, বাবা। না হয় ওরা সালিশি ডাকবে। এর পেছনে কারা আছে আমি জানি। তরফদার তার ছেলের জন্য আমার কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। আমি বলেছিলাম, না, এখন আমার মেয়েকে বিয়ে দেব না, তাকে আমি ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানাব। তরফদারকে তো তুমি জান, সে তো এক মাফিয়া আর তার ছেলেটা বদমাশের হাড্ডি।

সেদিন রাতে পাভেল আবার ফেরার হলো। পরের দিন জলিলের ফার্নিচারের দোকানে হাজির হলো। পাভেল যখন সাতবছর পর প্রথম পানিছত্র গ্রামে ফিরেছিল তখনই জেনেছিল এই কয়বছরে জলিল চিত্রনাট্য লেখা বাদ দিয়েছে। ফার্নিচার তৈরির কাজ শিখে দোকান দিয়েছে উপজেলা সদরে। জলিলের দেয়া ঠিকানা ধরে সপ্তাহখানেক পরে সে চলে গেল যশোরে আশার বাসায়।

এতোদিন পর পাভেলকে দেখে আশা অবাক হয়ে গেল। তার মনে পড়ে গেল পাভেলের সাথে তার শেষ কথোপকথন। হৃদয়ের কোন গোপন তন্তুতে তখনও পাভেলের জন্য অপেক্ষাটা রয়ে গেছে।

– ছেলেটা কেমন রে, আশা?

– ভালো। ব্যবসার কথাই বেশি ভাবে। তবে ভালো। তুই তো কিছু খাচ্ছিস না!

– খেতে ইচ্ছা করছে না।

– তোর তো কোন কিছুই ইচ্ছা করে না! আমাকে বিয়ে করতেও ইচ্ছা করল না!

– নারে, পারতাম নারে! অনেক ভেবে দেখেছি।

– কী জানি, কী ভেবেছিলি! আসলে তোর পালাতেই ভালো লাগে!

তখনই, হঠাৎ করেই যেন, পাভেল তার পালানোর আসল কারণটা খুঁজে পেল। সে এই ভালোবাসাটা হারাতে চায় নি। তার বাবা আর আশার বাবার সুসম্পর্ক টিকে থাকবে কি থাকবে না তা আসলে আপাত যুক্তি হিসাবে হাজির হয়েছিল। কিন্তু আসল কারণ হলো সে চারপাশে দেখতে পাচ্ছিল বিয়ের পরে প্রেমের সম্পর্কগুলো কেমন যেন শুকিয়ে যায়। আশার ভালোবাসা সে হারাতে চায় নি।

– আমার প্রতি তোর ভালোবাসা আমি হারাতে চাই নি, তাই বিয়ে করিনি। বিয়ে

করলেই ভালোবাসা হারিয়ে যেত।
আশা বলল: শামসুর রাহমানের মাকে নিয়ে একটা কবিতা আছে যেখানে মাকে কখনো গান গাইতে শোনা যায় না। যেন তিনি সব গান কোন কাঠের সিন্দুকে লুকিয়ে রাখেন। পরে সেগুলো থেকে সুর নয়, শুধু ন্যাপথলিনের তীব্র ঘ্রাণ ভেসে আসে! তোর জন্য আমার ভালোবাসারও একই অবস্থা। সেই ভালোবাসায় এখন আর কোন সুর নাই রে!
পাভেল অবাক হয়ে আশার মুখের দিকে তাকালো। আর তখন সে তার নাকে সত্যিসত্যি ন্যাপথলিনের ঘ্রাণ পেল। তার কাছে মনে হলো যেন আশার কপাল, গাল, ঠোঁট, অর্থাৎ যেখানে যেখানে তার চুমুচিহ্ন আছে, সেইসব চুমুচিহ্ন থেকে ঘ্রাণটা ছড়িয়ে পড়ছে পুরো ঘরময়।

সেদিন গভীর রাতে ধোবাউড়া উপজেলা সদরে পৌঁছে পাভেল শুনতে পেল দিনা আত্মহত্যা করেছে। সালিশি তাকে ব্যভিচারিণী সাব্যস্ত করেছিল।

সাদাত সায়েম
কবি, গল্পকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। পেশায় সাংবাদিক। জন্ম ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরে। বর্তমানে ঢাকায় বসবাস।
লেখকের বই:
পিপাসার জিনকোড (কাব্যগ্রন্থ [ই-বুক])
হাসিকান্না স্টোর (বাংলা গল্পগ্রন্থ)
Disgrace and Others (ইংরেজি গল্পগ্রন্থ [ই-বুক], প্রকাশিতব্য)

দুটি অণুগল্প

মাহমুদুল হক আরিফ

লকডাউন

লকডাউন এর একষট্টিতম দিনে হাজার টাকার শেষ নোটটি নেড়েচেড়ে দেখছিলাম আমি। ওর কোন জাত-ধর্ম নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের লোগোটার দিকে তাকিয়ে আছি। ওর প্রতি আমার উপচে পড়া প্রেম বিরহের সমাপ্তি ঘটবে। পরিবারের সাথে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের সূচনা হবে। পরিচিত হাসিগুলো নিমিশে মিলিয়ে যাবে- দুর্দান্ত প্রতাপে ক্রিজে দাঁড়িয়ে থাকা ৯৯ রানে আউট হয়ে ফেরা কোন প্লেয়ারের মতো 'বিষাদ গীত', গাইবে বাড়ির প্যাভেলিয়নে।

তারপরও বেঁচে থাকবো- ছোট মেয়েটা অনেকগুলো নোটের ছবি এঁকে বলবে 'লাগবে? এই নাও।' সে সমাধান দিয়ে দেবে। আমি নাক দিয়ে শুঁকে দেখবো ওর আঁকা নোটে আসল টাকার দুর্গন্ধ নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক ওর কাছে তুচ্ছ! আমি ওর সাথে ভান করবো! গন্ধমুক্ত টাকাই যেন আমার প্রেম।

ব্যবচ্ছেদ

লাশটা পরে ছিল রাস্তায়। একটা কাক কা কা করে ডাকছিল সজনে গাছে। একটা চন্দন রঙের কুকুর নাক শুঁকে পরখ করে দেখছিল- বোধ হয় মনিবের ঘ্রাণ মেলেনি, চলে গেল। প্যাঁ পুঁ করতে করতে একটা এ্যাম্বুলেন্স বেড়িয়ে গেল, একটুপর কর্পোরেশনের একটা ময়লার গাড়িও বেড়িয়ে গেল। একটা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গাড়ি ব্রেক না কষে দ্রুত চলে গেল। কেউ কাছে ঘেষেনি। একজন ফটোসাংবাদিক ছবি তুললেন। দূর থেকে কেউ কেউ অনুমান করে বললেন হত্যা। কেউ বললেন আত্মহত্যা হবে হয়ত!

লাশের কাছে এক পাগল হাত উচিয়ে বলল এটা লাশ নয়- কাছে আসো, দেখে যাও এটা তোমাদের গণপ্রজাতন্ত্র।

মাহমুদুল হক আরিফ
সাবেক রাজনৈতিক কর্মী এবং
অণুগল্পকার

আতঙ্কিত মুখেরা
হিরন্ময় চন্দ
মাধ্যম: কাগজে জল রং
সাইজ: ২২ইঞ্চি ২৮ইঞ্চি

পিপাসার জিনকোড: উড়ে যাবার মোরাকাবা

বদরুজ্জামান আলমগীর

সব মিলে ১৫টি কবিতা নিয়ে সাদাত সায়েমের কবিতার বই পিপাসার জিনকোড ইবুক হিসাবে বের করেছে ভাঁটফুল প্রকাশন। বইটি ছোট, কিন্তু অনেকগুলো তৎপরতা এর চারদিকে জড়ো হয়েছে।

ইবুক, যদ্দূর জানি কেউ কেউ বিচ্ছিন্নভাবে বের করেছেন, কিন্তু ভাঁটফুল-এর প্রস্তুতি ভিন্ন। তাঁরা বাণিজ্যিক প্রকল্পে ইবুক করার উদ্যোগ নিয়েছেন। বেশ কিছু বই ইতোমধ্যে অবমুক্ত করেছেন, আরো কিছু বইয়ের কাজ চলছে। বইগুলো দেখতে নিটোল, নির্বাচন দূরপ্রসারী। খুব নিষ্ঠা নিয়ে বইগুলোর অলঙ্করণ করেছেন হিরন্ময় চন্দ।

কিছু বই বাঙলায় লেখা, কিছু তাদের ইংরেজি; পিপাসার জিনকোড বাঙলা ও ইংরেজিতে পিঠাপিঠি। নিশ্চয়ই তাঁদের পরিকল্পনা বাঙলা কবিতার আর্তি আন্তর্জাতিক পাঠক পরিসরে পৌঁছানো। ফলে এক মলাটের ভিতর ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, আলো আর আলোকবর্তিকা পুরে দিয়েছেন।

সাদাত সায়েম যে কবিতাগুলো লিখেছেন তাদের শিরোনাম: রাক্ষসদেশের গল্প। সুতী নদীর তীরে ফাগুন। পথ শহর ছেড়ে যাচ্ছে। পিপাসার জিনকোড। ভরা-কটাল চোখ। কাশফুলহীন শরৎ। শরতের পদাবলী। সুন্দরবনের পাঁচালি। কানাইঘাট। মেঘমল্লার। কৈশোর। মিথুন। সমুদ্রর্শন। যানজট। ছবিটা আমার বোনের। জারিন তাসনিম কবিতাগুলোর ইংরেজি তর্জমা করেছেন এই নামে: Tales of Rakshas Land. Fagun, On The Bank Of Suti. A Path Leaving The City. Genecode of Thirst. Flood-Tide Eyes. Autumn Wihtout Kashful. The Autumn Verses. Narrative Of The Sundarbans. Kanaighat. Meghmallar. Adolescence. Copulation. Sea Viewing. Traffic Jam. That Photo Is Of My Sister.

সায়েম দাঁড়িয়ে আছেন ভিড়ের মাঝখানে নিরলে, সম্মিলিত ত্রস্ত হাহাকারের অধীনে, এখানেই তাঁর কবিতার নবীবৃত্তি; সবার ভাঙচুর, ক্ষরণ, স্মৃতিকীর্তন তাঁকে দিয়ে বয়ান করায় আখ্যানের বন্ধন ও সাহচর্য। তিরিশি কবিদের হাত ধরে বাঙলা কবিতায় যে গড়ন দানা বাঁধে সেখানে তাঁরা নিঃসঙ্গ, কিন্তু সাদাত সায়েমে আছে একাকিত্ব; ফলে পিপাসার জিনকোডে দেখি মানুষ এবং মানুষে, মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের নানামাত্রিক

দাগ ও লেনদেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়, ভরসার ব্যাকুলতাই তাঁর মূল শক্তি। সায়েমের চলন মায়ামিশানো, অভিব্যক্তি স্মৃতিজাগানিয়া।

পিপাসার জিনকোড- এর প্রথম কবিতা- রাক্ষসদেশের গল্প। কবিতার কিছু অংশ এমন: একা একা হাঁটি/ ফেলে আসা গল্পের আঁকাবাঁকা মেঠো পথে; শুনি/ হালিমার মা বলে চলেছে সন্তর্পণে/ রাক্ষসদেশের কাহিনী অফুরান।

আখ্যানের অন্তর্গত মোকাম সামষ্টিকতা; এবং যখনই একজন কবি/ কবিয়াল একটি আখ্যান বর্ণনা করেন তখনই বুঝে উঠতে পারি- কবি উঠোনভর্তি, দুনিয়াঠাসা মানুষের সঙ্গে তা ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন- তিনি আর ভারি অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে একাএকা ভেঙেভেঙে পড়ছেন না- তিনি বিষন্ন, কিন্তু আতঙ্কিত নন। সমষ্টির সঙ্গে একীভূত হবার সুরটি একান্তই সায়েমের নিজের। সাত দশকের কবিতায় সামষ্টিকতার যে কাঠামো ছিল- সায়েম তার থেকে আলাদা, ৮ বা ৯ দশকের কবিতায় নিজের মধ্যে, নিজস্ব প্রতিবিম্বের নিকটে ফিরে আসার যে অন্তর্মুখিনতা- পিপাসার জিনকোড সেদিক থেকেও পৃথক; তাঁর পয়ার সহজিয়া, চারণ কবির চিত্ত এখানে ধুলাসংবর্তী।

পিপাসার জিনকোড নামের মধ্যেই একটি নিঃসঙ্গ যৌথতার ইশারা আছে। গ্রাম এসে মিশেছে হয় ইস্টিশনের মোড়ে, নয় শহর এসে ব্রেইক কষেছে হরিণডাঙার পৈথানে; কিন্তু তাদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক সখ্য গড়ে ওঠেনি। এই সখ্যটুকু গড়ে না ওঠার যে ক্ষরণ, পান থেকে চুন খসে নদীর জলে আগুন জ্বলে ওঠার মর্সিয়া-ই সাদাত সায়েমের কবিতার জায়গা ও জমিন।

বড় আশার কথা- বাঙলা কবিতার এক অবিচল মুসাফিরানায় নিষ্ঠ, স্নাত কবি সাদাত সায়েম। পথচলার মাইলফলক আমরা দেখেছিলাম চর্যাপদে কী মায়ায় খোদাই করা আছে। কাহ্নপার পদ:

যে যে আইলা তে তে গেলা।/ অবনাগমনে কাহ্ন বিমনা ভইলা / কাহ্ন কহি গোই করিম নিবাস/ জো মন গোঅর সো উয়াস।

প্রাথমিক পাঠে মনে হতে পারে, সায়েম নিসর্গের নুন চেখে দেখার এক ভ্রমণ পিপাসার্ত কবি। পটাপট সমীকরণ হতে পারে এমন: তিনি বুঝি রবার্ট ফ্রস্ট যে-মেজাজে নিউ হেম্পশায়ার ঘুরে দেখেন, অথবা ওয়াল্ট উইটমেন প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া লেখেন- সায়েম তেমনই প্রকৃতির মাধুরি অন্বেষাকারী এক পরিব্রাজক; কিন্তু আসলে এই কবি তাঁদের থেকে মৌলে ভিন্ন: অনেকটাই হয়তো সায়েমকে জীবনানন্দবীক্ষার সঙ্গে মেলানো যায়। সেখানেও তাঁকে আবার সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে দেয়া যায় না; কিছু হয়তো মোটিফের বুটকি আছে, মাঝেমধ্যে তার দাগ পরিষ্কার- কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচ্ছদে ঢাকা নন। ২টি জীবনানন্দ দাশ আর ২টি সাদাত সায়েম পাশাপাশি পড়ে দেখা যাক।
পুকুরের পানা শ্যালা- আঁশটে গায়ের ঘ্রাণে / গিয়েছে জড়ায়ে;/ - এইসব স্বাদ;/ এ সব

পেয়েছি আমি- বাতাসের মতন অবাধ/ রয়েছে জীবন, নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন/ একদিন/ এইসব সাধ/ জানিয়াছি একদিন- অবাধ- অগাধ;
জীবনানন্দ দাশ- বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি।

একা-একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে/ করেছি অনুভব;/ তখন অনেক রাত- তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা/ নির্জনে ঘিরেছে এসে;
জীবনানন্দ দাশ- পথ হাঁটা : বনলতা সেন।

সাদাত সায়েম এমন:
বহুদিন পর আবার/ দেখা হলো আমার সাথে আমার/
দেখি হেঁটে যাচ্ছি / ছিন্নমূল- চারপাশে জনতার ঢল /
তবুও কী ভীষণ একাকী!/ জলের সিঁড়ি নেমে গেছে বহুদূর / অতলে পড়ে আছে স্মৃতির পুতুল / বিগ বেঙের দিকে ফিরছে সময় / আর পুতুল ফিরে পাচ্ছে তার ভরা-কটাল চোখ!
ভরা-কটাল চোখ : পিপাসার জিনকোড।

সেদিন মেঘকে দেখলাম একটা ছইতোলা নৌকায়/ শহর পাড়ি দিচ্ছে, মুখে গাঢ় জন্মবেদনার রেখা/ ছলকে উঠলো হঠাৎ আমাকে দেখে শহরের রাস্তায়/ হাত নাড়লো মৃদু, শেষ হলো ক্ষণিকের দেখা-অদেখা। শুধু বৃষ্টি নামলো ঘটা করে আমার স্বপ্নের উঠোন জুড়ে।
পিপাসার জিনকোড : পিপাসার জিনকোড।

সাদাত সায়েমের প্রকৃতি দেখাদেখি, নিসর্গের পুষ্টিগুণ পরখ করে দেখার মানসের ভিতর খুব স্বাভাবিকভাবেই আরো কিছু সমগোত্রীয়, প্রতিবেশী কবির কথা চকিতে মনে পড়ে যায়। বাঙলা ভাষার কবিদের মধ্যে হয়তো নৈকট্য নয়, হয়তো বা আভিমুখ্যের নিবিড়তার কারণেই কখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কী জীবনানন্দ দাশ, চকিতে একঝিলিক মনে পড়ে আবুল হাসান, বা আবিদ আজাদের কথা।

আবুল হাসান-এর রাজা যায় রাজা আসে কাব্যের বনভূমির ছায়া কবিতাটির কিছু অংশ মেলে দেখি:

আমাদের বাস চলতে লাগলো ক্রমাগত/ হঠাৎ এক জায়গায় এসে কী ভেবে যেন/ আমি ড্রাইভারকে বোললুম- রোক্কো- শহরের কাছের শহর/ নতুন নির্মিত
একটি সাঁকোর সামনে/ দেখলুম তিরতির কোরছে জল/ আমাদের মুখ সেখানে প্রতিফলিত হলো।

অন্যদিকে সাদাত সায়েম এভাবে বলেন:

লাবনী পয়েন্ট থেকে আমরা ক্রমাগত দক্ষিণে/ হেঁটে গেলাম, তবু সূর্য নোনাজলে ডুবে গেল/ আমাদের ভীষণ কান্না পেল। শুধু নিঃসঙ্গ এক / জেলে জাল ফেলে সূর্যটাকে ধরতে চাইল।
সমুদ্রদর্শন: পিপাসার জিনকোড।

পথচারী কবির সঙ্গে যে কোন নিসর্গনিষ্ঠ কবির, লেখকপ্রাণের, দার্শনিকতার মিলমিশাদ, পানচিনি হয় মোটামুটি ৪রকমভাবে: প্রকৃতির প্রাঙ্গণে, নিসর্গের প্রাণে মানুষের আসা-যাওয়া, স্মৃতি- বিস্মৃতি ঘুরেঘুরে আসে, কিন্তু মানুষই শেষপর্যন্ত থেকে যায় প্রাধান্যে, নির্ধারকের আসনে। এক্ষেত্রে রবার্ট ফ্রস্টের মূল কবিতা Stopping by woods on a snowy evening, এবং শামসুর রাহমানের অনন্য অনুবাদে তার বাঙলা:

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep.

কাজল গভীর এ-বন মধুর লাগে,
কিন্তু আমার ঢের কাজ বাকী আছে
যেতে হবে দূর ঘুমিয়ে পড়ার আগে,
যেতে হবে দূর ঘুমিয়ে পড়ার আগে।

আরেক ধরনের প্রকৃতিনিষ্ঠা, নিসর্গ অবগাহন আছে যেখানে প্রকৃতি প্রাধান্যে, প্রকৃতি গ্রাহক; কবি বা দার্শনিক গৃহীত। এ-বেলায় মেরি ওলিভারের কথা পাড়া যায়, মিলিয়ে দেখা যায় সুইডিশ কবি ঈডিথ সোডারগ্রেন-এর মূল সুইডিশ থেকে এভারিল কারডির ইংরেজি তর্জমা Now it is fall -এর রওশন হাসানকৃত বাঙলা ভাষান্তর- এখন ঋতুবদলের দিন।

My head on my arm I fall asleep easily,
On my eyes a mother’s breath,
From her mouth to my heart:
Sleep child, and dream now the sun is gone.

মা বলছেন, ঘুমাও,আমার আত্মজা
এবং স্বপ্নের মাঝে প্রবেশ করো
এখন সূর্য ডুবে গিয়েছে।

দার্শনিক অধ্যাপক আর্নি ন্যাস-এর ডিপ ইকোলজি শব্দবন্ধ কয়েন করার কল্যাণে প্রকৃতির সকল প্রাণী অপ্রাণী সমান হিস্যার অধিকারে গৃহীত হয়। সাহিত্যে তারও একটি শাখা চিহ্নিত হয়ে ওঠে। ইউসুফ জাকিরকৃত লি পির চিং-টিং পর্বতের উপর

জাজেন কবিতাটি এরকম:

The birds have vanished down the sky. Now the last cloud drains away.
We sit together, the mountain and me, until only the mountains remain.

আকাশের বিস্তারে পাখিরা মিশে গেল। শেষ তবক মেঘও ঝরে নাই হয়ে যায়। আমরা-আমি আর পর্বত একে-অন্যে মিশে বসে আছি- গিরিমালা যতোক্ষণ আপনি জাহির।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে ব্যক্তির উন্মেষের ধ্যানে প্রকৃতির বিপুল পাঠে এক তৃতীয় নয়নের ঘনঘোর চাহনি দেখি:

দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে / আনন্দ সভা ভবনে দাঁড়াও / বিপুল মহিমায় গগনে মহাসনে / বিরাজ করে বিশ্বরাজ / দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে।

কবিতার মহান যজ্ঞে সাদাত সায়েম এখনো তাঁর অবস্থান ষোলআনা পাকা করেননি; উঠোনজুড়ে নামে তুমুল বৃষ্টির অঝোর ধারাপাত- তিনি হয়তো আকুল স্তব্ধতায় সেখানে নেয়ে ওঠেন, আবার বুঝি মাথাকোটা গাঙের ঢেউ তারই বিবাগী ঘরে এসে বিছিয়ে পড়ে। চন্দ্রপাওয়া মেঘের তলে লুটিয়ে পড়ে একটি দুঃখী লোকগীতির সুর!

রাজনৈতিক ঘেরাটোপে, সামাজিক শক্তির বিন্যাসে সাদাত সায়েমের অনির্দিষ্টতা-ই আপাতত সায়েমের গন্তব্য- তিনি উড়ে যান অন্তর্মুখী মোরাকাবায়, ঠোঁটে জীবনের তৃষ্ণা অন্ধকারের নূরে জ্বলেজ্বলে থাকে কনফারেন্স অব দি বার্ডসের পাখিদের যেমন।

আমার প্রতীতি হয় এই বইয়ের কেন্দ্রীয় কবিতা: পথ শহর ছেড়ে যাচ্ছে। এই কবিতায় লেগে আছে কবির মনোলোকের ক্ষরণাভা ও মৌলিক টিপসই:

একটা পথ শহর থেকে বেরিয়ে সোজা/ হেঁটে যাচ্ছে মাথা নিচু করে; বুকে তার লেগে আছে ছেঁড়া খাম।

সায়েম কবিতার আলো-আঁধারির পুলসিরাতে ভারসাম্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন, কিন্তু অগ্নিপরীক্ষা মোকাবেলা করেছেন অনুবাদক জারিন তাসনিম।

মূল কবিতা ও তার ইংরেজি ভাষান্তর পিঠাপিঠি জুড়ে দেবার কারণে কিছু সুবিধা হয়েছে, আবার একই সঙ্গে খটকাও খানিকটা লেগেছে বৈকি। অনুবাদের কাজটি অনেকটা প্রেম পর্যায়ের গান- যে দূরে থাকে কিন্তু প্রাণে থাকে নৈকট্যের ফানাফিল্লাহ; এখানে মূল বাঙলা কবিতার পাশাপাশি ইংরেজি রূপ নির্দিষ্ট করে দেবার ফলে অনেকটা প্রেমের বদলে বৈবাহিক সম্পর্কের বৃত্তাবদ্ধতা জারি থেকেছে। বাঙলা কবিতাটি পড়ার পর একজন পাঠকের মনে যে সংবেদের বাঙময়তা গড়ে ওঠে- কবিতার ইংরেজি অনুবাদকের সেক্ষেত্রে দায়িত্ব হয়ে পড়ে সেই অনুরণনটি হুবহু মোতায়েন করা- যা

আসলে সম্ভব নয়। ভাষান্তরিত কবিতাটি মৌলিক কবিতার অনুবাদ হলেও তা সেই কবিতার রিপ্রিন্ট নয়- অন্য আরেকটি কবিতা। তারপরও আশার কথা এই- জারিন তাসনিম দিব্যি নাছোড়বান্দা- চেষ্টার কসুর করেননি। অধীনতার সামগ্রিক চাপের মধ্যে থেকেও তিনি মাঝেমাঝেই সফলতার ঝিলিক দেখিয়েছেন। একটি কবিতা পাশাপাশি রেখে পাঠ করলেই তার সত্যতা মিলবে।

সমুদ্রদর্শন

জলধির একটা চিরকুটই যথেষ্ট ছিল/অথচ আকাশে উঠল মোহন চাঁদ/সাগর আছড়ে আছড়ে পড়ল চন্দ্রালোকে/সারারাত, নারকেল পাতা বুকে পিঠে মাখল/ দূরাগত জলোহাওয়ার ধারাপাত

লাবনী পয়েন্ট থেকে আমরা ক্রমাগত দক্ষিণে/ হেঁটে গেলাম, তবু সূর্য নোনাজলে ডুবে গেল/আমাদের ভীষণ কান্না পেল। শুধু নিঃসঙ্গ এক/ জেলে জাল ফেলে সূর্যটাকে ধরতে চাইল

জোয়ারের জলে ভেসে আসল জীবনের কলধ্বনি/সমবেত আমরা নীলজলে ঝাপ দিলাম/জলতলে কান রেখে শুনলাম/দূরাগত কান্নার ধ্বনি/ ভাটার টানে আমাদের দুঃখকে ভেসে যেতে দিলাম।

Sea viewing

A small note from the sea was enough/ Yet a fascinating moon rose above the skies/ The sea waves broke on the shore in the moonlight/ The coconut leaves rubbed on its chest and/back throughout the night/Misty wind coming from afar.

We kept walking southwards from the Laboni Point/ Yet into the salty waters the sun did set,/Bringing tears to our eyes. Just a solitary fisherman/ Tried to catch the sun with his net./

With the flow-tide came life’s music/Together we jumped into the blue water/Our ears pressed against the current of underwater/We listened to the distant sound of tears/We watched the ebb taking away our sorrows.

বাঙলা একটি লোকগান আছে এমন-

কাষ্ঠে লোহায় পীরিত করে নৌকারে সাজাইয়া পরে
দুইয়ে মিলে যুক্তি করে শুকনাতে রবে না।

বাঙলা এবং ইংরেজিতে অনূদিত কবিতাগুলোর মধ্যে এমন একটি যুক্তি গড়ে ওঠার যে প্রত্যাশা জন্মায়- তা কখনো কখনো কার্যকর হয়েছে, মাঝেমধ্যে হয়নি। মূল সমুদ্রদর্শন কবিতাটির ভাষাবিন্যাস, চিত্রকল্পের ব্যবহারে যে কিছুটা অবিন্যস্ততা আছে ইংরেজি কবিতাটি তা অনেকখানিই পুষিয়ে দেয়।

আবার কখনো কখনো বাঙলা-ইংরেজি দুটো কবিতা-ই বেশ ফুলেশস্যে ফলবতী হয়ে উঠেছে। নিচের কবিতাটি অবগাহন করি।

কানাইঘাট
১.
এখানে স্তব্ধ-দিঘির তল থেকে/ উঠে আসে ঘুঘুর ডাক
-- কানাইঘাট/ হৃদয়জুড়ে আনন্দের ফল্গুধারা
দুচোখে তবু তার জল অবিরল

২.
গাড়িতে বসে আছি নিঃস্তব্ধ/ ধুকপুক ধুকপুক
-- মোটরের হৃৎপিণ্ড/ দিগন্ত থেকে ভোরের সূর্য উঠে এসে/ আমার পাশে চুপ করে বসে

৩.
অন্ধকারে পাশাপাশি হাঁটি/ তার কাঁধে রাখি হাত
-- মৃত্যুর/ সে তো আমার সহোদর/ তবু মাগি আরো একটা ভোর

Kanaighat
1.
Here, from the bottom of a quiet lake/ The cooing of the dove comes out/ —Kanaighat/ There's a current of joy in its heart/ Yet there are constant tears in its eyes.

2.
I am sitting in silence in a car/ Vroom vroom/ — Heartbeat of the motor/ On the horizon comes up the dawn's Sun/ And sits sliently next to me.

3.
Side by side I walk/ On its shoulder a hand I keep/ — Death/
It's my kin/ Yet I solicit another dawn.

জারিন তাসনিম-এর মেধা, শ্রম আর নিষ্ঠা আরো শস্যবান হতে পারতো- তিনি যদি আরেকটু স্বাধীনতা নিতেন, ঝুঁকি নেবার ক্ষেত্রে আরো খানিকটা ডেসপারেট হতেন। পিপাসার জিনকোড নামটি একদম অক্ষরে-অক্ষরে Genecode of Thirst করলে এটিকে আর কবিতার বই মনে হয় না- প্রাণিবিজ্ঞানের কোন একটি বিদ্যায়তনিক পুস্তক

বলেই অনুমান জন্মায়। জটাচুলের ইংরেজি Tangled hair থেকে বাঙলা ভাষাভাষী পাঠক প্রচুর উদ্যমী হয়ে হয়তো বুঝেও ফেলতে পারেন, কিন্তু ইংরেজি ভাষাভাষীর কাছে টেঙ্গলড হেয়ার জটাচুল নয়; চুলে যখন প্যাঁচ লেগে থাকে, আর চিরুনি চালাতে বেশ বেগ পেতে হয়- সেটি টেঙ্গলড হেয়ার; জটাচুলকে বলে Dreadlocks.

মাত্র ১৫টি কবিতার শীর্ণকায় পিপাসার জিনকোডে প্রায় একটি নিস্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে যাচ্ছিলো, এক মনোরম মনোটোনাস ক্লান্তি বুঝি বেড় দিয়ে আসছিলো, কিন্তু কবি সাদাত সায়েম জীবনের নানা রং ও পরতের ভিতর দিয়ে যাবার উন্মুখরতা জানেন, তাই তিনি একরৈখিকতা ভাঙতে আপনাআপনিই এগিয়ে আসেন:

মেঘমল্লার কবিতাটি মেঘমল্লার রাগের অনুকূলে চিরচেনা পথে একরৈখিকভাবে বিন্যস্ত হয়ে উঠতে পারতো! কিন্তু কবি এখানে মেঘমল্লারকে তার অন্তর্লোকের নৈঃশব্দ্যে বর্ণনা করে গড়ে তুলেছেন বুঝি বসন্ত বাহার। মৃতদেহের শিথান ঘেঁষে একটি শিশু ঝলমলিয়ে হেসে উঠলে ঘনীভূত হয়ে ওঠে আরো বেদনার অসহায় লাল তরমুজের ফালি।

এবেলায় মেঘমল্লার থেকে কয়েকটি লাইন পড়া যাক:

একটি মেয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল/ কিছু হারানো সুর মেঘমেদুর/ আমাদের উঠোন জুড়ে নূপুরধ্বনি উঠল।

পিপাসার জিনকোডজুড়ে তার সমূহ লক্ষ্মণ আছে- নিষ্ঠার কাছে, নক্ষত্র রঙিন রঙে ও ধুলার মলিনতায়, জীবন সুন্দর পতনে আর পল্লবে- সাদাত সায়েম তা জানেন।

ভাঁটফুল থেকে প্রকাশিত ই-বই:

শাহবাগ মন উদ্বাগ : ইচক দুয়েন্দে

দূরত্বের সুফিয়ানা : বদরুজ্জামান আলমগীর

এগারো সিন্দুর : রফিক জিবরান

তিন ডানাওয়ালা পাখি : রফিক জিবরান

পিপাসার জিনকোড : সাদাত সায়েম

মাটির উনুন ও যুবকের ওম : সৈয়দা হাবিবা

ভাঁটফুল থেকে প্রকাশিতব্য ই-বই:

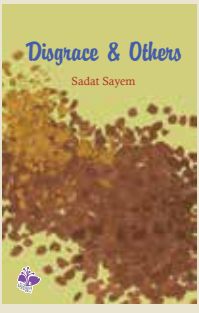

বইগুলো পেতে ভিজিট করুন:

www.bhatful.com